কালের কাণ্ডারী

পরিবেশক :
দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর | ১৯৬৪

প্রকাশক ঃ
রেখা বিশ্বাস
'মাঙ্গলিক'
উত্তরায়ণ | মধ্যমগ্রাম
উত্তর ২৪ পরগণা।

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
দীননাথ সেন।

মুদ্রক ঃ
পৃথ্বীশ সাহা
অমি প্রেস
৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট
কলিকাতা-৯।

কালের কাণ্ডারী

লক্ষ্মী এলেন গ্রামে

একটা কিছু ঘটেছে, বুঝলে, আগে ত এমন ছিল না। চাষবাস এদিকে ভালই হত; কিন্তু এবার যেন ফেটে পড়ছে! মা লক্ষ্মী এসেছেন নাকি! মুখে মুখে এই কথা। চারিদিক সবুজে সবুজ। এ বছর দেখছি রোগজ্বালাও কম। ম্যালেরিয়া ঘুমিয়ে পড়ল না কি! আমোদরে এবার কত জল বেড়েছে ভাইরে! দুপা গেলেই গলা জল। জয়রামবাটীতে মা এসেছেন।

রোদ ঝলমলে সকাল। মাথার ওপর আকাশের নীল সাগর। কত রকমের পাখি। পাখি দেখেই দিন কেটে যায়। ঝুপড়ি গাছের মাথায় নিরাপদ বাসা। মা ঠোঁটে করে খাবার এনে শিশুদের খাওয়াচ্ছে। চিৎকার চেঁচামেঁচির শেষ নেই। ভারি চেহারার কুবো পাখি পাতার আড়ালে বসে মাঝে মাঝে ডাক ছাড়ছে। তার ডাকটা এমন, যেন জজসায়েব এজলাসে হাতুড়ি ঠুকছেন, সাইলেন্স, সাইলেন্স।

সরু কাঁচা রাস্তা এঁকে বেঁকে উত্তরে চলেছে প্রান্তর পেরিয়ে। এদিকটা খুব উর্বর। আখের ক্ষেত। যেন পাইপ দিয়ে জমির অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে চিনির রস তুলছে। ভগবানের কত কেরামতি! আখকে বললেন, চিনি তৈরি

করে আমার প্রজাদের খাওয়াও! খেজুরকে বললেন মাটি শুষে রস তুলবে টং-এ। মানুষ কলসি বেঁধে মাটিতে নামাবে, জ্বাল দিয়ে তৈরি হবে নলেন। পৌষ পার্বণে পিঠের সুগন্ধে, গুড়ের গন্ধে গ্রামের বাতাস ভরে যাবে। এক ঠ্যাঙা তাল। সে বললে আমিই বা কম যাই কিসে। আমার পাতায় হবে হাত পাখা। সেই পাখায় মা বাতাস করবে তার শিশুটিকে। আমার রসেও গুড় হবে। অন্য স্বাদ, অন্য গন্ধ। মিছরি হবে ভারি উপকারী। তালশাঁসের ভেতর ভরে রাখব এক চুমুক জল। তার বড় অদ্ভুত স্বাদ। পাকা তালে তৈরি হবে জন্মাষ্টমীর বড়া। নন্দ খেয়ে নাচবেন।

প্রচুর রবিশস্য, শাকসবজি, গম। মাঠ জুড়ে ফসল যেন হই হই করছে। পথ পথের রেখা ধরে এগোচ্ছে। উত্তরে আরও উত্তরে। ঢালু হয়ে নামছে। ভিজে ভিজে বাতাস লাগছে শরীরে। জলের গন্ধ। ওই ত আমোদর নদ। বাতাস খেলে যাচ্ছে তরঙ্গভঙ্গে। শতটুকরো রোদের হাসি। পরিসরে তেমন বড় না হলেও বেশ গভীর। বারমাসই জল থাকে। জয়রামবাটীর মানুষ আমোদরকেই গঙ্গা বলেন। দল বেঁধে সব স্নানে আসেন। শিশুরা ঝাঁপাই ঝোড়ে। সাঁতার কাটে।

নদের ওপারে ওটা কোন দেশ? ওই ত দেশড়া। বেশ বড় একটা গ্রাম। আমোদর এঁকে বেঁকে নেচে নেচে বহে চলেছে। এই বাঁকাবাঁকির ফলে দুটি উপদ্বীপ তৈরি হয়েছে। বৃক্ষাদির শোভায় অপূর্ব। দুটি কুঞ্জবন। পাখিদের জলসাঘর। উত্তরপূর্ব কোণের উপদ্বীপটি কূর্মপৃষ্ঠের মতো। সেখান বৃহৎ বৃহৎ গাছ, বট, অশ্বত্থ, আম, বকুল, গুলঞ্চ। ফুলে ফুলে আকুল। ছায়া সুনিবীড় একটি ভূখণ্ড। এখানে কিন্তু বিদায়ের বাঁশীই বাজে। ঝরা ফুলের পথ বেয়ে মানুষ পারি দেয় অমৃতলোকে। এইটিই জয়রামবাটীর পবিত্র শ্মশান। ঠিক মাঝখানটিতে বিশাল এক আমলকী গাছ।

আমোদর উত্তর থেকে পূবে বাঁক নিয়েছে, জয়রামবাটীকে যেন ঘিরে রেখেছে স্নিগ্ধ বলয়ে। পূর্বদিকের পরপারে তাজপুর। দক্ষিণে জিবট্যা। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মসিনাপুর। আর পশ্চিমে শিহড়।

এদিকে অনেক ইতিহাস আছে। বাঁকুড়া ত যে-সে জায়গা নয়! আকৃতি অনেকটা ত্রিভুজের মতো। পুরুলিয়া, বর্ধমান, হুগলী আর মেদিনীপুরের মাঝখানে আটকে আছে। এবড়ো-খেবড়ো। মল্লভূম। রাজা ছাড়া রাজ্য হয় না। ইতিহাসের শুরুতেই যাঁর নাম পাওয়া যাচ্ছে তিনি হলেন মহারাজা

সিংহ বর্মন, পুশকর্ণের মহান অধিপতি। শুসুনিয়া পাহাড়ের একপাশে পাথরের গায়ে বিরাট এক জ্বলন্ত চাকার তলায় নিজের কালকে, নিজের রাজত্বের কাহিনীকে কালজয়ী করে রেখে গেছেন। তারপর বহু রাজত্বের উত্থান-পতনের পথে সভ্যতা দানা বেঁধেছে। ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রাচুর্য আর রিক্ততা যেন সাদা আর কালো দুটো ঘোড়া। বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে বিশাল একটি বৃক্ষ তার ডালপালা বিস্তার করে জেলাটিকে স্নিগ্ধ ছায়ার বেদীতে বসিয়েছে। মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছে, কোঁচড়ে সম্পদ ভরে দিয়েছে, আবার হঠাৎ পাতাঝরার দিনে রুক্ষ প্রান্তরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

দলমাদল আজও উঁচিয়ে আছে পুরনো সেই দিনের কথা বলার জন্যে। রাজা গোপাল সিংহ। সেই রাজপুত ব্রাহ্মণের রাজত্বসীমা কি ভাবে মাপা যাবে? খুব সহজ। ষোল দিনের ভ্রমণসীমা। সেই রাজত্বের বাৎসরিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। কোন শত্রুর ক্ষমতা ছিল না সেই রাজ্যসীমার মধ্যে নির্বিবাদে ঢোকার। সুজাখাঁ একবার চেষ্টা করেছিলেন। দলবল নিয়ে হানা দিয়েছিলেন। রাজ্যসীমার কাছাকাছি আসা মাত্র জলাধার খুলে দেওয়া হল। প্রচণ্ড জলস্রোতে ভেসে গেল বাহিনী।

কি অপূর্ব ব্যবস্থা ছিল রাজা গোপাল সিংহের! আক্রমণকারী, লুঠেরা হানাদার নয়, বণিক তুমি এস। তুমি বছরে আমাকে বিশ লাখ তঙ্কা দাও, আমি তোমাকে এখুনি অবাধ বাণিজ্যের অধিকার ছেড়ে দিচ্ছি। এখানে তোমার সম্পদ, তোমার স্বাধীনতায় কেউ ভুলেও হাত দেবে না। তুমি বণিক, তুমি পর্যটক, তুমি যেই হও, আমার রাজ্যে প্রবেশ মাত্রই তোমার রক্ষণাবেক্ষণের, তোমার স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত দায়িত্ব আমাদের। এখান থেকে কারো কখনো কোনও জিনিস চুরি হয়নি। এ-রাজ্যে চোর নেই, ডাকাত নেই, তবু রাজ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নিখরচায় তোমাকে প্রহরী দেওয়া হবে। সেই প্রহরী তোমার সমগ্র ভ্রমণপথে রিলে রেসের মত তোমাকে তার প্রহরাসীমার শেষে অন্য প্রহরীর হাতে তুলে দিয়ে তার আচরণের সার্টিফিকেট নিয়ে মুখ্যপ্রহরীর কাছে ফিরে এসে রেহাই পাবে। মুখ্যপ্রহরী আবার রাজার কাছে তুমি কেমন রইলে নিয়মিত সেই খবর পাঠাতে থাকবেন। এমনি করে নির্ভাবনায় পরম নিশ্চিন্তে তুমি এই জেলায়, আমার এই রাজত্বসীমায় ঘুরে বেড়াবে। স্থান থেকে স্থানান্তরে যদি এইভাবে তুমি ভ্রমণ করতে থাক দিনের পর দিন, তোমার থাকার অথবা খাওয়ার কোন

খরচই লাগবে না। এমন কি তোমার সওদা, তোমার সম্পদ বহন করার জন্যে নিখরচায় একজন বাহকও পাবে। যদি তুমি কোনও সম্পদ যেমন টাকার থলি অসাবধানে হারিয়ে ফেল, তাহলেও চিন্তার কোনো কারণ নেই। যিনিই সেই থলি কুড়িয়ে পান না কেন, সবচেয়ে কাছের কোন গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে তিনি নিকটবর্তী চৌকিতে গিয়ে সেই খবর দেবেন। চৌকিরক্ষক সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁড়া পিটিয়ে সমস্ত জেলাবাসীকে এই খবর জানিয়ে দেবেন।

এ কী গল্প কথা! রূপকথার রাজ্য! না, না। একদা এমনই ছিল — বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। পৃথিবীর আশ্চর্য। বিদেশী পর্যটকরা বিভিন্ন সময়ে এসেছেন। সকলেই বিস্ময় নিয়ে ফিরে গিয়ে লিখেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা। মার্কোপোলো লিখলেন, 'দেখে এলাম সেই দেশ। অধিবাসীদের অধিকাংশই বণিক। সকলেই বিশ্বাসী ও রাজভক্ত। এঁরা কখনো কোন কারণে মিথ্যা কথা বলেন না। জগতে এঁদের মতো সাধু আর দ্বিতীয় কোনো জাতি নেই। এঁরা মাংস খান না। মদ্যপান করেন না। পরস্ত্রীর প্রতি অনুরাগী হন না। এঁদের জীবন সর্বতোভাবে পবিত্র।'

ফরাসী রেনল লিখলেন, 'যে সব সাম্রাজ্য পৃথিবীর পীড়ক, অত্যাচারী রাজাদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছে, তাদের সঙ্গে এই বিষ্ণুপুরের কত তফাৎ! এই রাজ্যের ভিত্তি হল সুশৃঙ্খলা আর স্বাভাবিক ধর্মনীতি, যা চিরকাল অক্ষয়। অত্যাচারীদের রাজ্য বুদ্বুদের মতো। ফোটে আর ফাটে। কিন্তু এইরকম রাজ্যের ধ্বংস নেই।'

এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এই মল্লরাজারা সুখে সমৃদ্ধিতে রাজত্ব করেছেন এই অঞ্চলে। রাজকাহিনীর শুরু ৬৯৪ খৃস্টাব্দে। মল্লাব্দের প্রবর্তন। আদিমল্ল রঘুনাথ। ১৫৮৭ তে বীর হাম্বির। ১৭১২ তে গোপাল সিংহ। শেষ রাজা চৈতন্য সিংহ। ১৭৪৮ থেকে ১৮০২। তারপরেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যাবতীয় সর্বনাশা কাণ্ডের সূত্রপাত।

এ যে কত প্রাচীন অঞ্চল! মহাভারতের কালে চলে যাই। ফরিদপুর, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, বরিশাল, চব্বিশ পরগনা যখন সমুদ্রগর্ভে, এ মল্লভূমি বা মল্লবনি সেই সমুদ্রের উপান্তে মাথা জাগিয়ে ছিল। একদা সমুদ্র ঢেউ ভাঙত এই দেশের তটভূমিতে। প্রাচীন মন্দিরের গাত্রে, পাথরে, ইটে বহু রণতরীর ছবি উৎকীর্ণ। সমুদ্রের স্মৃতি।

খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোক কলিঙ্গ জয় করলেন। অনেকে বলেন মল্লভূমির একাংশ তখন কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে মালব দেশের রাজা চন্দ্রবর্মা মল্লভূমি আক্রমণ করেছিলেন। শুসুনিয়া লিপির পাঠোদ্ধারে এ তথ্য জানা গেছে।

সপ্তম শতাব্দীতে কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক রাঢ় দেশ অধিকার করলেন। তখন এই মল্লভূমি ছিল রাঢ়ের এলাকা। এরপরই এসে গেল আদিমল্লের কাল। রামরাজ্যের বাস্তব রূপায়ণ। জয়রামবাটীর অনতিদূরে এত বড় ইতিহাসের প্রবাহ! বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবেই এই ভয়ঙ্কর ক্ষত্রিয়রা প্রকৃত শিক্ষিত ও সুসভ্য হয়ে উঠেছিলেন। যুদ্ধে যুদ্ধে রক্তাক্ত হয়নি রাজ কাহিনী। রাজ্যরক্ষার প্রবল অস্ত্র ছিল জল। সাতটি বাঁধ — লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, শ্যামবাঁধ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, গন্টনবাঁধ, পোকাবাঁধ। এ যেন আর এক বৃন্দাবন। বাঁধের জলে নৌকো চলে। জলক্রীড়া। ঘিরে আছে পুষ্পশোভিত উদ্যান। সেচের কাজ হয়। এবং শত্রু বিতাড়ন। বাঁধের জল তোড়ে ছেড়ে দেওয়ার কৌশলে আক্রমণকারীদের অবশ্যম্ভাবী সলিলসমাধি। হাজার বছর ধরে নিশ্চিন্তে রাজ্যপাট বিস্তার। ইতিহাসের খাঁজে খাঁজে এমন দু-একটি উদাহরণ থাকে পরবর্তীকালের উপমা।

নবদ্বীপ পরিত্যাগ করে মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে পুরীতে প্রস্থান করলেন। নবদ্বীপ ম্লান হয়ে গেল। শ্রীচৈতন্য আঠারো বছর পুরীতে লীলা করেছিলেন। চৈতন্যালোকে আলোকিত হল শ্রীক্ষেত্র। তাঁর তিরোধানের পর বৃন্দাবন। ষট গোস্বামীরা চৈতন্যবর্তিকায় বৃন্দাবনের মহিমা উজ্জ্বল করে রাখলেন আরও অর্ধশতাব্দীকাল। ১৫৩৩ থেকে ১৬০০। জীবগোস্বামীর অন্তর্ধানের পর শ্রীনিবাস আচার্য সেই শিখা নিয়ে এলেন এই বিষ্ণুপুরে। পরবর্তী দুটি শতাব্দী বিষ্ণুপুরের রাজসভাই হল বৈষ্ণব ধর্ম, শিক্ষা, দীক্ষার প্রধান কেন্দ্র।

সময় ঘুরতে ঘুরতে কোথা থেকে কোথায় যে যায়! খুব কাছেই যে শ্রীচৈতন্য আবার আসবেন। এবার আর বৈষ্ণব নন, ঘোর শাক্ত। তান্ত্রিক। সিদ্ধ কৌল। বিষ্ণুপুরে যার অবসান, কলকাতার অদূরে তার অভ্যুত্থান। হুগলীর সঙ্গে বাঁকুড়ার মিলন। আবার একশো কি দুশো বছর নয়, আগামী হাজার হাজার বছরের মহাপথে নবজীবনের বার্তা বইবে। এবারের রাজপ্রাসাদ পর্ণকুটীর। পথের ধুলোর সিংহাসন। এবারে কালীর খেলা। মা আবার বৈষ্ণব।

বীর হাম্বির বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর নাম নিলেন 'চৈতন্য দাস'। এক সময় তিনি দস্যুপতি ছিলেন। 'চৈতন্য দাস' নামে তিনি কিছু গান লিখেছিলেন। নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তি রত্নাকরে' তার কয়েকটি উদ্ধৃত করেছেন। বৃন্দাবন তাঁর প্রাণের জায়গা। বিষ্ণুপুরের কয়েকটি দীঘির নাম রাখলেন কালিন্দী, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড। গ্রামের নাম হল দ্বারকা, মথুরা।

দস্যু সর্দার বীর হাম্বির বৈষ্ণব হলেন। তিনি হলেন, না মহাপ্রভু তাঁকে এসে ধরলেন। কে নিয়ন্ত্রণ করেন জগতের ঘটনা! মহাপুরুষদের শরীর অপ্রকট হয়। তাঁদের ভাব আর সাধনা যাবে কোথায়! বাঁশি ভেঙে গেলেও সুর ত থামে না। বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী আর এই বাংলার তিন গোস্বামী। রাজার ছেলে নরোত্তম, ব্রাহ্মণ সন্তান শ্রীনিবাস আর একজন নিম্ন সম্প্রদায়ের শ্যামানন্দ। এঁরা তিনজনই বাল্যাবস্থাতেই ভাবে মহাপ্রভুকে দর্শন করতেন। তিনজনেরই জীবন তিন প্রান্তে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল মহাপ্রভুর শক্তিতে। শক্তি নিয়ে এসেছিলেন, শক্ত হাতে ধর্ম আর সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্যে।

তিনজনেই বৃন্দাবনে এসে জীব গোস্বামীকে পেলেন শিক্ষাগুরু হিসাবে। জীব গোস্বামী একদিন শিষ্যত্রয়কে বললেন ভক্তিশাস্ত্রে তোমরা সিদ্ধ হয়েছো, এইবার তোমরা গৌড়দেশে যাও। ভক্তি শেখাও মানুষকে। ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ভক্তই ভগবান লাভ করে। শুধু গ্রন্থপাঠে ফল হয় না। উপযুক্ত ধারক যদি ব্যাখ্যা না করে ভক্তির মর্ম অন্তরে প্রবেশ করে না। গ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে তোমরা গমন কর।

শ্রীনিবাস বললেন, 'আমরা সন্ন্যাসী আমরা গৃহী হব কেমন করে, তাছাড়া আপনাকে ছেড়ে আমরা থাকব কেমন করে। আপনার সঙ্গ ছাড়া স্বর্গও সুখের নয়।'

জীব গোস্বামী বললেন, 'গুরুর আদেশ। আমি তোমাদের আদেশ করছি। সত্য লাভ করে অপরকে বিতরণ করাই সন্ন্যাসীর আদর্শ। যাও।'

১২১ খানি গ্রন্থ নির্বাচিত হল, তার মধ্যে রইল সনাতনের হরিভক্তিবিলাস, হরিভক্তিরসামৃত সিন্ধু, চৈতন্যচরিতামৃত, উজ্জ্বল নীলমণি, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, দানকেলী-কৌমুদী ইত্যাদি। একটি কাঠের বাক্সে বইগুলি সাজান হল। চাপা দেওয়া হল একটি মোমজামা, যাতে জলে নষ্ট না হয়। বিশাল একটি শকট আনা হল। বাহক, চারটি বলবান ষাঁড়। দশজন সশস্ত্র ব্রজবাসী

নিযুক্ত হলেন প্রহরী। জয়পুর- রাজের অনুমতিপত্র নিয়ে যাত্রা শুরু হল। বৃন্দাবন থেকে গৌড়। দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ। সারা ঊর্ধ ভারতের তখন টালমাটাল অবস্থা। আকবরের গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বকাল আর কয়েক বছর মাত্র। পাঠানদের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ। গৌড়ের অধীশ্বর তখন মোগল বিতাড়নে ব্যতিব্যস্ত। দেশের নৃপতিরা লুটপাটে যত উৎসাহী রাজস্ব দেওয়ার ব্যাপারে ঠিক ততটাই নিরুৎসাহী। সেই সময় গৌড়েশ্বরের এমন ক্ষমতা ছিল না যে দেশীয় নৃপতিদের স্বৈরাচার দমন করেন। ফলে বঙ্গের অবস্থা — এলোমেলো করে দে মা। লুটেপুটে খাই।

বিষ্ণুপুরই একমাত্র ব্যতিক্রম। ঠিক ওই সময়টায় বীর হাম্বিরের রাজত্বকাল। সেই সময় চারপাশের পরিস্থিতি বড় সুবিধের ছিল না। দিবসের জমিদার রাতের দস্যু। পুস্তকবাহী শকট, তিন সন্ন্যাসী আর দশজন সশস্ত্র ব্রজবাসী চলেছেন। বঙ্গে প্রচারিত হবে ভাগবতের ভক্তি, শ্রীচৈতন্যের প্রেম। পথে পড়ল ছোটনাগপুরের বিশাল অরণ্য — ঝারিখণ্ড।

এই সেই অরণ্য! কোকিল-কলরব-মুখরিত বনশোভা। মহাপ্রভু একদা এই অরণ্যে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ছুটোছুটি করতেন। তখন তাঁর অখণ্ড দিব্যভাব। ভক্তির আবেশে বৃক্ষলতাদিকে কৃষ্ণজ্ঞানে আলিঙ্গন করতেন আর প্রেমাশ্রুতে ভেসে যেতেন। সন্ন্যাসীত্রয় এই মহিমা অনুধাবন করে ভূমিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন। সর্বত্র বৃক্ষ নয়, সর্বত্র শ্রীচৈতন্য। সর্বত্র তাঁর পদরেণু। বামে মগধের প্রান্তভূমি। অরণ্যের পর প্রশস্ত পথ।

একটি বৃহৎ শকট। পেছনে গেরুয়াধারী তিনজন সন্ন্যাসী ও দশজন সশস্ত্র ব্রজবাসী। বীর হাম্বিরের গুপ্তচররা মনে করলেন, অবশ্যই বহু ধনরত্ন চলেছে একস্থান থেকে অন্যস্থানে। একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে — কি যায়? সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, রত্ন, রত্ন যায়। তিনি বললেন ভাবার্থে। বাক্সবোঝাই জ্ঞানের অমূল্য রত্ন। এরা বুঝল আক্ষরিক অর্থে। রাজপ্রাসাদে খবর হল। রাজ জ্যোতিষী গণনায় বসলেন। বিচারে জানা গেল শকট ধনরত্নে পরিপূর্ণ।

গুপ্তচরেরা ফিরে এল, সঙ্গে হাম্বিরের দস্যুদল। তারাও পেছন পেছন চলেছে। উপযুক্ত স্থানে লুণ্ঠন হবে। পথে একটি জায়গা এল। জায়গাটির নাম তামর। তামরের অরণ্যে গভীর রাতে দস্যুদল কালীপূজা করলেন। পরিকল্পনা ছিল সেই রাতেই লুঠ হবে। কোনো কারণে সে গ্রামে সুবিধে

হল না। পরদিন ভোরে শকট ধীর গতিতে যাত্রা করল। প্রথমে রঘুনাথপুর, তারপর পঞ্চবটী। পঞ্চবটীর দক্ষিণে একটি সম্পন্ন গ্রাম মালিয়ারা। সেই মালিয়ারায় সন্ন্যাসীত্রয় এক সদাশয় ভূস্বামীর আতিথ্যগ্রহণ করে রাত্রিযাপন করলেন। সকালে উঠে দেখলেন শকটও নেই। বইয়ের বাক্সও নেই। দস্যুদল অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

সেই রাতে বীর হাম্বির জেগে বসেছিলেন। প্রচুর ধনরত্ন বোঝাই পেটিকাটি আসছে। দস্যুদল যথাসময়ে এসে গেল। হাম্বির মহা খুশি। বাক্স খোলার আগেই দস্যুদের পারিশ্রমিক আর পুরস্কার দিয়ে বিদায় করলেন।

শেষ রাতে রাজভাণ্ডারে রাজা একা। একটি ঘিয়ের মশাল দেয়ালে গোঁজা। আলো, ছায়ার নৃত্য সারা ঘরে। একালের ভাষায় স্ট্রং রুম। এইবার বাক্সটি খুলবেন। খুললেন। সরালেন মোমজামা। এ কী? প্রথমেই বেরলো একটি সংস্কৃত পুঁথি। কি অপূর্ব অক্ষর। যেন মুক্তার মালা! মহাপ্রভু যেমন বলতেন, 'রূপের আখর যেন মুকুতার পাঁতি।' রাজা অবাক হয়ে পাতা উলটাচ্ছেন। এইরকম একটি নয়, একশো একুশখানি।

রাজ জ্যোতিষিকে ডেকে পাঠালেন। সদ্যঘুম ভাঙা চোখ! 'এই আপনার ভবিষ্যদ্বাণী! এই আপনার ধনরত্ন!'

পণ্ডিত নতমস্তক। কোনো কথা নেই।

রাজা বললেন, 'ভুল কিছু বলেন নি। যা বলেছেন তার চেয়েও বেশি। রত্নের রত্ন। যে জহরত চেনে তার কাছে এসব মহামূল্য, অমূল্য রত্ন।'

গুপ্তচরকে ডেকে পাঠালেন, 'কোন সাধু — কোন পণ্ডিতের আজীবন সাধনার সম্পদ তোমরা লুঠ করে এনেছ? তাঁদের ওপর কোনো অত্যাচার হয়নি ত?'

গুপ্তচর বললে, 'মহারাজের নিষেধ আমরা সর্বদা স্মরণে রাখি। যেখানে বিনা অত্যাচারে কাজ হয়ে যায় সেখানে আমরা খুনজখম করি না। নিরীহ সাধুদের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগেনি।'

রাজা বললেন, 'সে বেশ। তা না হলে তাঁদের নিঃশ্বাসে আমার রাজপ্রাসাদ দগ্ধ হয়ে যেত।'

অনুতপ্ত রাজা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

রানী সুদক্ষিণা এসে তাঁকে রাজঅন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন। মশাল জ্বলে জ্বলে নিবে গেল। গুপ্তকক্ষে রয়ে গেল সেই বাক্স।

তিন সন্ন্যাসী ভাবছেন এর চেয়ে তাঁদের মৃত্যু হলেই ভাল হত। সাধুমহান্তদের আজীবন তপস্যার ফল বিলুপ্ত হল। একটিরও নকল নেই। পরিকল্পনা ছিল, বঙ্গদেশ থেকে এগুলি নকল করে সারা ভারতে প্রচারিত হবে। হরি-ভক্তি বিলাস, চৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি মহারত্ন চিরদিনের জন্যে বিলুপ্ত হল।

শ্রীনিবাস ভেঙে পড়লেন না। গ্রামবাসী একজনের কাছ থেকে কাগজ কলম চেয়ে নিয়ে জীব গোস্বামীকে চিঠিতে সব বৃত্তান্ত জানালেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তখন অতি বৃদ্ধ। এই দুঃসংবাদে তিনি প্রাণ হারালেন।

নরোত্তম আর শ্যামানন্দকে গৌরমণ্ডলে পাঠিয়ে শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরেই রইলেন। যতদিন হৃতরত্নের সন্ধান করতে না পারছি ততদিন এই স্থান পরিত্যাগ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রাণ যায় যাক। ন দিন ক্রমান্বয়ে তল্লাস চালিয়ে শ্রীনিবাস জানতে পারলেন এ-রাজ্যের রাজাই একজন দস্যু। অতএব সেখানে কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না।

দশম দিনে তিনি একটি গ্রামে পৌছলেন। গ্রামটির নাম দেওয়ালি। পাশ দিয়ে বহে চলেছে যশোদা নদী। মাত্র মাইলখানেক দূরে বিষ্ণুপুর। এক তরুণ ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে দেখা হল। যুবকের নাম কৃষ্ণবল্লভ। তিনি তখন বটু ব্যাকরণ পড়ছিলেন। শ্রীনিবাসের সঙ্গে আলাপ করে কৃষ্ণবল্লভ বুঝতে পারলেন অসাধারণ এক পণ্ডিত এসেছেন। তিনি প্রার্থনা জানালেন, অনুগ্রহ করে যদি ব্যাকরণ আর অলঙ্কার শাস্ত্র পড়তে শ্রীনিবাস কৃপা করে সাহায্য করেন।

শ্রীনিবাস ব্রাহ্মণের অনুরোধে তাঁর গৃহে রইলেন। সাধু সর্বত্যাগী। পরনে কটিবাস। একাহারি। স্বপাকে ভাতে ভাত। শ্রীনিবাস কৃষ্ণবল্লভকে পড়াতে লাগলেন। চুম্বক যে-ভাবে লোহাকে আকর্ষণ করে। শ্রীনিবাসের বিষণ্ণ, করুণ মূর্তি, তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য কৃষ্ণবল্লভকে ঠিক সেইভাবে আকর্ষণ করল।

কৃষ্ণবল্লভ রাজসভায় ব্যাসাচার্যের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনতে যেতেন। একদিন শ্রীনিবাস জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাগবত-পাঠ কেমন শুনলে'? কৃষ্ণবল্লভ বললেন, 'কি বলব? আমি যে আপনার সঙ্গ ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারি না। আমার মন সদাসর্বদা আপনার পাদপদ্মে নিবিষ্ট থাকে তাই কি শুনেছি জানি না, তাড়াতাড়ি চলে এসেছি।'

'তুমি কাল আমাকে নিয়ে যাবে?'

পরের দিন কৃষ্ণবল্লভ শ্রীনিবাসকে নিয়ে গেলেন। প্রথমদিন শ্রীনিবাস নির্বাক হয়ে ব্যাসাচার্যের ব্যাখ্যা শুনলেন। দ্বিতীয় দিন আর থাকতে পারলেন না। শ্রীনিবাস বললেন, 'আচার্যদেব! আপনি প্রশস্ত পথ ছেড়ে এ কি ব্যাখ্যা করছেন!'

ব্যাসাচার্য একথার কোনও উত্তর দিলেন না।

তৃতীয় দিনেও শ্রীনিবাস বললেন, 'আপনি ভাগবত ব্যাখ্যা করছেন অথচ শ্রীধরকে ত্যাগ করে নিজের মত স্থাপন করার চেষ্টা করছেন। শ্রীধর স্বামীর টীকা ছাড়া রাসপঞ্চাধ্যায় বোঝা অসম্ভব।'

ব্যাসাচার্য শ্রীনিবাসের কথা কানেই তুললেন না। নিজের মতো ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। তখন রাজা সভাপণ্ডিতকে বললেন, 'এই ব্রাহ্মণ আপনার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারছেন না, আপনি কি ভুল ব্যাখ্যা করছেন?'

ব্যাসাচার্যের অহঙ্কারে লাগল। তিনি বিরক্তির সুরে বললেন, 'এই গৈরিকধারী যুবকের আস্পর্দ্ধা দেখেছেন! আমার ব্যাখ্যায় ভুল ধরতে পারে এমন পণ্ডিত এই ভূভারতে দ্বিতীয় কে আছে!'

শ্রীনিবাসের দিকে তাকিয়ে ব্যাসাচার্য রূঢ়কণ্ঠে বললেন, 'আসুন, আপনি ভাগবত ব্যাখ্যা করুন, দেখি আপনি কত বড় পণ্ডিত।' এই বলে তিনি বেদী পরিত্যাগ করলেন।

শ্রীনিবাসের সামান্যতম কুণ্ঠা নেই। জড়তা নেই, ভয় নেই। ধীর, স্থির। বেদীর আসনে বসে ব্যাখ্যা শুরু করলেন। সে কি কণ্ঠ, পাণ্ডিত্য, ভাব, ভক্তি। সে ব্যাখ্যা যেন নৈবেদ্য, ভাবাশ্রুসিক্ত পুষ্পের ডালি, ভগবৎ চরণে ভক্তের নম্র নিবেদন। যেন সপ্ততন্ত্রী বীণায় স্বয়ং নারদ সুরঝঙ্কার তুলছেন। রাজা ও শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ। এমন ব্যাখ্যা তাঁরা কখনো শোনেন নি। কে এই অলৌকিক সন্ন্যাসী! দেবলোক থেকে এলেন না কি? সকলে, এমন কি ব্যাসাচার্যও বুঝলেন — সত্যসত্যই বিষ্ণুপুর রাজ্যের প্রকৃত গুরু এলেন এতদিনে।

পরের দিন রাজসভায় তিলধারণের জায়গা রইল না। শ্রীনিবাসের পাঠ শুনবেন। শ্রীনিবাস যখন পুঁথির বন্ধন উন্মোচন করছেন, বিপুল হরিধ্বনি। সেদিনের ব্যাখ্যা হল আরো অনবদ্য। প্রত্যেকের চোখে জল। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস। পাষাণও গলে গেল। সবাই দেখছেন, পাঠক মানুষ নন, জ্যোতির্ময় এক দেবতা। স্বয়ং ভাগবত।

সভাভঙ্গের পর রাজা স্বয়ং অনুগত ভৃত্যের মতো শ্রীনিবাসকে অনুসরণ করে রাজপ্রাসাদের এক বিশিষ্ট কক্ষে নিয়ে গেলেন। সবিনয়ে অনুরোধ করলেন, আপনি এইখানে অবস্থান করে এই রাজগৃহকে যদি ধন্য করেন! উপাদেয় ভোজ্যের ব্যবস্থা করলেন।

শ্রীনিবাস বললেন, আমি একবার আহার করি, স্বপাকে — ভাতে ভাত।

সন্ধ্যাবেলা রাজা তাঁকে নিভৃতে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্রাহ্মণ! আপনি কে? কেন এসেছেন? শুনেছি, কোনো বিপদে পড়ে আপনি এরাজ্যে এসেছেন। আমি যদি আপনার কোনো সাহায্যে আসতে পারি আপনি কোনো দ্বিধা না করে আমাকে বলুন।'

শ্রীনিবাসের চোখে জল এল। তিনি সব ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, 'গোস্বামিগণের এই অমূল্য জ্ঞানরত্নভাণ্ডার তাঁরা বিশ্বাস করে আমার হাতে দিয়েছিলেন। এই সম্পদ উদ্ধার করতে না পারলে আমার মৃত্যু হওয়াই ভাল। আমার সঙ্গী এক রাজকুমার আর এক তরুণ সাধু শোকার্ত হয়ে বঙ্গ দেশে চলে গেছে।'

রাজা শ্রীনিবাসের পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গ হয়ে বললেন, 'আমার মত নরপিশাচ আর নেই। আপনারা যে-দস্যুকে খুঁজছেন আমিই সেই দস্যু। আমার মতো অপরাধী এত বড় রাজ্যে আর দুটো নেই। আপনার সেই সব গ্রন্থ যেমন ছিল ঠিক সেই রকমই আছে। আপনার আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। আমার রাজ্যে নরহত্যাকারীর যে-সাজা, আপনি সেই সাজাই আমাকে দিন।'

রাজা বীর হাম্বির শ্রীনিবাসের পায়ে পড়লেন। রাজবেশ ধুলোয় লুটোচ্ছে। রাজা কাঁদছেন। শ্রীনিবাস তাঁকে হাত ধরে তুললেন। তাঁর চোখেও জল। কত বড় প্রাপ্তি! কয়েকদিন পরেই রাজা, রানী সুদক্ষিণা, সভাপণ্ডিত ব্যাসাচার্য ও আরো কয়েকজন শ্রীনিবাসের কাছে দীক্ষা নিলেন! রাজা তাঁর রাজ্যশাসনের ভার শ্রীনিবাসের ওপর ছেড়ে দিলেন। সন্ন্যাসী হলেন রাজা।

সময়ের নদী ধরে সময় চলেছে তির তির করে, পল, অনুপলের তরঙ্গভঙ্গে। বীর হাম্বির থেকে ধাড়ি হাম্বির, রঘুনাথ সিংহ, বীর সিংহ, দুর্জন সিংহ, রঘুনাথ সিংহ, গোপাল সিংহ, চৈতন্য সিংহ। ১৭৪৮ সালে শুরু করলেন।

বঙ্গদেশের তখন ভঙ্গদশা। নবাবদের নকশা চলেছে। বিদেশী বণিককুল উঁকিঝুঁকি মারছে। সুজাউদ্দিন, সরফরাজ এইসব চলছে। মুসলমানদের শাসন। সরফরাজকে উলটে দিলেন আলিবর্দি। আলিবর্দি ছিলেন পাটনার শাসনকর্তা। অতি চতুর লোক। সরফরাজকে বুঝতেই দিলেন না তিনি যুদ্ধ করতে আসছেন। বিপুল বাহিনী নিয়ে পাটনা থেকে যাত্রা করলেন। ঘোষণা করলেন লড়াই একটা হবে, সে লড়াই বিদ্রোহী ভোজপুরীদের সঙ্গে। পথে এক জায়গায় তিনি একজন মৌলভির হাতে কোরাণ আর একজন ব্রাহ্মণের হাতে গঙ্গাজলের ঘটি আর তুলসীপাতা দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। সমস্ত সেনাপতি ও সৈন্যদের ডেকে পাঠালেন। মুসলমানেরা কোরাণ আর হিন্দুরা তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলেন, আলিবর্দি যা বলবেন, তা ন্যায় হোক, অন্যায় হোক তারা তা পালন করবে বিনা প্রশ্নে।

রাজপ্রাসাদের অদূরে আলিবর্দি তাঁবু ফেললেন। সরফরাজ তাঁর দেড়হাজার বাঁদি নিয়ে দিবারাত্র বিভোর। তিনি শুনলেন, সদলে বন্ধু এসেছেন পাটনা থেকে। বেশ ত! তোমরা আপ্যায়নের ব্যবস্থা কর।

বন্ধুই বটে! গর্জে উঠল আলিবর্দির কামান।

এ কি? এ ত যুদ্ধের আহ্বান! এ ত বন্ধু নয়, শত্রু। সরফরাজ হাতির পিঠে উঠে বসলেন। যুদ্ধে যাবেন। মাহুত বললে, জাঁহাপনা! পারবেন না। হাজার হাজার সৈন্য! কামানের সংখ্যাও অনেক। বরং দ্রুতবেগে হাতি ছুটিয়ে দি বিষ্ণুপুরের দিকে। রাজা গোপাল সিংহের প্রবল প্রতাপ। তাঁর সাহায্যে আলিবর্দির সঙ্গে যুদ্ধ করা যেতে পারে।

'নবাব সে কথা শুনলেন না। বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দির বিরুদ্ধে মহাবীরের ন্যায় যাত্রা করে রণক্ষেত্রে তিনি মহাপ্রয়াণ করলেন।' ১৭৪০ সাল। আলিবর্দি বসলেন বাংলার মসনদে। আলিবর্দিকে বলা হত বীরশ্রেষ্ঠ। সুযোগ্য নবাব। বিচক্ষণ ত বটেই। সিংহাসনে বসতে না বসতেই শুরু হল বর্গীর হাঙ্গামা! ভাস্কর পণ্ডিতের হামলা। নবাবের কাছে ফতোয়া এল 'চৌথ' দাও। তোমার রাজস্বের চতুর্থাংশ আমাকে দিতে হবে। আলিবর্দি জানালেন, অসম্ভব।

মারাঠা-শক্তি কতটা শক্তি আলিবর্দির জানা ছিল না। তাঁকে বর্ধমানে পালাতে হল। তাঁর সৈন্যসামন্ত চতুর্দিকে ছত্রভঙ্গ। বর্গীদের উৎপাতে সোনার

বাংলা ছারখার। আলিবর্দি দশ লক্ষ টাকা দিয়ে ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে সন্ধি করতে চাইলেন। সুচতুর বর্গী অবস্থা বুঝে এক কোটি টাকা ও নবাবের সমস্ত হাতি চেয়ে বসলেন।

এমন অপমানজনক প্রস্তাব আলিবর্দি প্রত্যাখ্যান করলেন আবার। সুচতুর ভাস্কর, সুচতুর আলিবর্দি। সরাসরি প্রত্যাখ্যান নয়, ঝুলিয়ে রাখা। এদিকে দশ লক্ষ টাকায় আলিবর্দি সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করতে লাগলেন। যুদ্ধ ছাড়া এই শত্রুদের দমন অসম্ভব।

ভাস্কর পণ্ডিত ইতিমধ্যে নবাবের বিদ্রোহী কর্মচারি মীর হবিবের সঙ্গে হাত মেলালেন। মুরশিদাবাদের কাছে পলাশী, দাউদপুর প্রভৃতি গ্রামে লুঠপাট শুরু হল। ক্রমে সেই হাঙ্গামা ছড়াল, হুগলি, হিজলি হয়ে বর্ধমান ও ওড়িষার বালেশ্বরে। পূর্ণিয়া, বীরভূম, রাজমহলও চলে গেল মারাঠাদের দখলে। গঙ্গার পশ্চিম পারে নবাব আলিবর্দির আর কিছুই রইল না। পল্লীতে, পল্লীতে মায়েরা দুরন্ত শিশুকে ঘুম পাড়াতে লাগলেন এই ছড়া বলে, ‘খোকা ঘুমলো, পাড়া জুড়লো, বর্গি এল দেশে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দোবো কিসে!’

আলিবর্দির অনুমতি নিয়ে ইংরেজরা একটি পরিখা দিয়ে কলকাতাকে ঘেরার কাজ শুরু করলেন। সাত মাইলের একটি পরিখা। ছমাসে তিন মাইলের মতো হল— মারহাট্টা ডিচ।

এদিকে বীর আলিবর্দি আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হলেন। নৌসেতুর সাহায্যে ভাগীরথী পার হলেন। অতর্কিত এই আক্রমণের জন্যে ভাস্কর পণ্ডিত প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি পালাতে তল্পি তল্পা গুটালেন। তাঁর চেয়ে দ্রুত আলিবর্দির বাহিনী। ভাস্কর পালাচ্ছেন। আলিবর্দির তাড়া।

মারাঠারা আশ্রয় নিলেন বিষ্ণুপুরের ঘোর জঙ্গলে।

বর্গি এসেছে, বর্গি এসেছে। বিষ্ণুপুর আতঙ্কিত। রাজা গোপাল সিংহ বললেন, আমি কি করব? চল, সবাই মিলে আমাদের মদনমোহনকে বলি। রাজা সেই রাতে স্বয়ং মন্দিরে ধন্না দিয়ে পড়ে রইলেন।

রাতের অন্ধকারে স্থাণুর মতো সেই বিখ্যাত কামানটি, যার নাম দলমাদল বা দলমর্দন। অদূরে লালবাঁধ। অন্ধকার নিস্তরঙ্গ জলরাশিতে তারা ভরা আকাশের ছায়া। চারপাশ থমথমে। বর্গিদের তাঁবুতে চলেছে রাতের আক্রমণের নিঃশব্দ প্রস্তুতি। এই মারাঠারা নির্দয় অত্যাচারী।

পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ কামান এই দলমাদল। লম্বায় ১২ ফুট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি। মুখের ফাঁদ সাড়ে এগার ইঞ্চি। ভেতরটা সাড়ে চোদ্দ ইঞ্চি। এই কামানে কখনো মরচে পড়বে না। কামানের গায়ে ফারসিতে লেখা, এক লক্ষ পঁচিশ টাকা।

রাত অনেক হল। ভাস্করের দল এগিয়ে আসছে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ। কি হয়, কি হয়! বিষ্ণুপুরের সাধনা, সংস্কৃতি, সম্পদ, শান্তি, জনজীবন বুঝি ছারেখারে যায়। আক্রমণের সময়কাল ভাস্কর পণ্ডিত শেষ রাত নির্বাচন করেছেন, কারণ মানুষ তখন গভীর ঘুমে।

মন্দিরের পুরোহিত হঠাৎ এক অলৌকিক দৃশ্য দেখলেন। মন্দির অঙ্গনে একটি কাল ঘোড়া। সেই ঘোড়ার পিঠে দীর্ঘকায় এক শ্যাম পুরুষ। তিনি ক্ষিপ্রবেগে আক্রমণকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। মুহূর্তে মুহূর্তে গর্জে উঠছে দলমাদল। কে এই দেব মানব! নিমেষে ছত্রভঙ্গ লুঠেরার দল!

সকালে সবাই দেখলেন, পুরোহিত মন্দিরের দ্বার খুলেছেন, মদনমোহন বিগ্রহের সর্বাঙ্গে বারুদ, হাতে, পায়ে বারুদের কালি। বোঝা গেল, অন্ধকার রাতের যোদ্ধাটি কে? অনেক গোলা, গুলি ফেলে রেখে ভাস্কর পণ্ডিতের দল পালিয়েছে।

আজও মানুষ বিশ্বাস করে এই কাহিনী। রহস্যের কতটাই বা জানা গেছে! মাটি আর মানুষ। যে-মাটিতে মানুষ চরে বেড়ায়, একদিন দেহটা ফেলে রেখে চলে যায়, সেই মাটি দিয়েই দেব-দেবীর মূর্তি গড়ে অনন্তের পূজা করে। অসীম অরূপকে সসীম স্বরূপে বেঁধে ফেলে ভক্তের ভাগবত লীলা যুগ যুগ ধরে চলছে। মানুষ কখনো মানব, কখনো দানব।

নবাব এল, বর্গি এল, বন্যা এল, দুর্ভিক্ষ এল, ফসল এল, পঙ্গপাল এল, আবার বৃন্দাবন থেকে ভাগবত এসে বন্দী হল রাজগৃহে। বাহক হলেন সন্ন্যাসীরাজা। আবার নৃপতির নির্ভরতায় রাতের অন্ধকারে কালো ঘোড়া ছোটালেন শ্যামরায়।

সব গুটিয়ে গেল, আবার খুলবে বলে।

১৭৫৬ সাল। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার মালিক, মহাবীর, ধীরস্বভাব, সর্বজন প্রিয় নবাব আলিবর্দি ষোল বছর রাজত্ব করে দেহত্যাগ করলেন। নবাব হলেন সিরাজউদ্দৌলা। বয়েসমাত্র ১৯। ১৭৫৭। পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধের নাটক। পরাজয়। নৃশংস মৃত্যু। সব শেষ। ইংরেজের প্রবেশ। বিষ্ণুপুরের

শেষ রাজা চৈতন্য সিংহ। ১৮০২ সালে ইতি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। ইংরেজ। বদান্য জমিদার। অত্যাচারী জমিদার। বড়, বড় জমিদার। কুঁচো, কুঁচো জমিদার।

বিষ্ণুপুরের শেষ রাজা চৈতন্য সিংহ গ্রাম জয়রামবাটীর খেলারাম মুখোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠালেন। শুনেছি আপনি ধর্মঠাকুরের সেবায়েত। আপনাকে আমি প্রায় বারো কাঠা ব্রহ্মোত্তর ও প্রায় সাতকাঠা দেবোত্তর নিষ্কর ভূমি দান করছি। আপনারা বংশপরম্পরায় নির্বিঘ্নে সেবার কাজ চালিয়ে যাবেন — এই আমার প্রার্থনা।

কে এই ধর্মঠাকুর!

এক সময় বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে কচ্ছপরূপী ধর্মঠাকুরের পূজা হত। খুব জোরে ঢাকঢোল পিটিয়ে। ধর্মঠাকুর এক অপূর্ব সমন্বয়। বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি আবার শিবঠাকুরের জনগণ জীবন রূপ। দরিদ্র চণ্ডালের বন্ধু। সেই শিব, যে-শিব ছাইভস্ম মেখে শ্মশানে বসে থাকেন। সংসারের দায়ে ভিক্ষা করেন। প্রয়োজনে হলকর্ষণ করেন। বুদ্ধদেবের অনেক বিশেষণের একটি হল ধর্মধাতু। এক সময় চড়ক অনুষ্ঠান ধর্মঠাকুরেরই উৎসব ছিল। বর্ষশেষের গাজন একসময় ধর্মঠাকুরেরই উৎসব ছিল। রাঢ়দেশের গ্রাম্যদেবতা ধর্মঠাকুর। তাঁর গ্রাম্য লোকোৎসবের নাম ছিল গাজন। 'ক্রমে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা এই গাজনকে শৈব উৎসবে পরিণত করেছেন। শিব ক্রমে প্রধান গ্রামদেবতা হয়েছেন বলে ধর্মের গাজন সহজে শিবের গাজনে পরিণত হয়েছে। ধর্মপূজার পুঁথির রচয়িতা রামাই পণ্ডিত। বৌদ্ধধর্মই শেষকালে ধর্মপূজায় পরিণত হয়েছিল।

খেলারাম মুখোপাধ্যায়ের পর নরোত্তম, তারপর বৈদ্যনাথ, কার্তিকরাম। কার্তিকরামের বড়ছেলে রামচন্দ্র। আমরা ১৮৫৩ সালে এসে গেছি। এই মুখুজ্যেরা পুরুষানুক্রমে রামমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। তাহলে আদিপুরুষে ধর্মঠাকুর এলেন কি ভাবে?

মুখুজ্যেদের জয়রামবাটীতে আসার কারণের পেছনে একটি ধর্মবিপ্লবের ইতিহাস জড়িয়ে আছে বলেই মনে হয়। বৌদ্ধপ্রাধান্য থেকে হিন্দুসমাজ তখন বেরিয়ে আসছে। অনমনীয়-স্বভাব বৌদ্ধদের সমাজ অপাংক্তেয় করে দিচ্ছে। আর উদার বৌদ্ধদের তাঁদের দেবতাসহ হিন্দুসমাজ গ্রাস করে নিচ্ছে। বৌদ্ধদের দেবদেবীরা ক্রমে হিন্দু দেবদেবীর সমাসনে বসে হিন্দু পুরোহিতদের পূজা পেতে লাগলেন।

যজন-যাজন-অধ্যাপন, ব্রাহ্মণের জীবনের যেমন ধারা, সেই ধারাতেই প্রবাহিত হল মুখুজ্জেদের পরিবার। সম্পদ তেমন নেই সম্মান আছে। বিষয়ের অশান্তির বদলে নির্বিষয়ের অপার শান্তি। দীপজ্বলা রাতের কিনারায় সুখের নিদ্রা। সৎভাব, ভাবনা, সঙ্গ, প্রসঙ্গ। আকাঙ্ক্ষা—দেবতার হাত ধরে কর্তব্যের পথে একদিন স্নিগ্ধ অবসান। লোককল্যাণেই নিজের পরিবারের কল্যাণ।

রামমন্ত্রের উপাসক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র। পশ্চিমের গ্রামটির নাম শিহড়। ওই গ্রামের আর এক সৎ, ধার্মিক মানুষ হরিপ্রসাদ মজুমদার। তাঁরই কন্যা শ্যামাসুন্দরী এলেন রামচন্দ্রের জীবনে। বড় মধুর মিলন। দুটি প্রাণই একসুরে বাজে। গ্রামের মানুষ একে অপরকে শিক্ষা দেবার জন্যে বলেন, 'যাও দেখে এস শিবের সংসার কাকে বলে! গিয়ে দেখ। দেখে শেখ।'

'ও শ্যামাসুন্দরী! তোমার বাড়িতে এলে মনে হয় যেন আশ্রমে এসেছি। তুমি ভাই মা লক্ষ্মী! কি তোমার গোছগাছ! অভাবেও অভাব নেই। দেখি ত আমরা।'

'দিদি! এ যে আমার ভক্ত ভগবানের সংসার। এ যে আমার গায়ের রক্ত!'

'কর্তাটি যেন ঠাকুর। শিবের মতো বসে আছেন বাইরের দাওয়ায়।'

নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র। অন্য বর্ণের দান নিতেন না। উপবাস, তাতেও আপত্তি নেই। তবু মাথা নিচু করব না অশাস্ত্রীয় আচরণের কাছে।

খুব তামাক খেতে ভালবাসতেন। একটু অবসর পেলেই হুঁকোটি হাতে নিয়ে দাওয়ায় বসতেন। সদা সন্তুষ্ট। সদা হৃষ্ট। পূর্বদ্বারী একটি দোচালা ঘর। মধ্যে দেওয়াল। দুপাশে সদর আর অন্দর। দক্ষিণে রান্নাঘর। ওই ত ঢেঁকিশাল। চালাটা ঝুঁকে আছে বলে পূবের রোদ বেশ কিছুটা দূরে খেলা করছে ছায়া নিয়ে। শীত শেষের গাছের নবীন পাতা নিয়ে। পাখিরা এইবার বাসা বাঁধবে। খড়কুটো মুখে নিয়ে উড়ে উড়ে যাচ্ছে। পথ পড়ে আছে পুব আর পশ্চিমে দিকবন্ধন করে। ওদিকে পুণ্যপুকুর, এদিকে আর একটি পুকুর। কলুগেড়ে তার নাম। দক্ষিণ দিকের আর একটি পুকুরের বড় শোভা। গোল করে তাল গাছ দিয়ে ঘেরা। বাঁড়ুজ্যে পুকুর। গ্রামের সবাই এই পুকুরে স্নান করেন। এই পুকুরের জলই পান করেন। আরও কিছুটা দক্ষিণে এগোলে প্রাচীন একটি পদ্ম পুকুর। অজস্র পদ্ম ফুটে থাকে। মা নিজের পূজা নিজেই

যেন সাজিয়েছেন। গ্রামের পশ্চিমে বিশাল এক জলাশয়। এটির নাম আহের। এরই জলে চাষবাস হয়।

রামচন্দ্র বসে আছেন হাতে হুঁকোটি নিয়ে। বড় মধুর সময় এই সকাল। সামনের পথ ধরে চলেছেন মানুষজন। হয়ত হাটেই যাচ্ছেন। সে-সব হাট কোথায়? পশ্চিম দিকে মাইলখানেক হাঁটি না! শিহড়ের হাটতলায় কয়েকটি ছোট ছোট দোকান আছে। আরও মাইল দেড়েক দূরে পুকুরে গ্রাম। সেখানে একটি মুদির দোকান। মিঠাই মণ্ডা চাই? তাহলে কামারপুকুরে যাই। অনেকটা হাঁটতে হবে, তা হক। সে এক মনোরম অভিযান। সবুজ ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে প্রায় মাইলখানেক হাঁটি। সবুজের ঢেউ উপভোগ করতে করতে। পথের ঢাল বেয়ে আমোদরের তীরে। ছোট কিন্তু গভীর। এখানে ওখানে ছোট বড় দহ আছে। জল অনবরত পাক খাচ্ছে। সে ঘূর্ণিতে অজস্র মাছের খেলা। মাঝে মধ্যে দু-একটা মেছো-কুমিরের দেখা মেলে। আচ্ছা, এইবার আমোদর পার হই। একটিমাত্র ছোট ডোঙা এ-পার, ও-পার করে। ওপারে বিশাল একটি প্রান্তর। বড় একটি গ্রামের ছবি দূরে। আবার হাঁটি গ্রাম লক্ষ করে। এই ত দেশড়া। কামারপুকুর প্রায় এসে গেছে। অমরপুর তারপরেই কামারপুকুর। পথটির অপূর্ব শোভা। ছায়াশীতল। দুপাশে বড় বড় বট আর অশ্বত্থ। কোনো কোনো গাছের তলে ক্লান্ত পথিক ক্ষণ বিশ্রামে তন্দ্রালু। মাঠে, মাঠে চরে বেড়াচ্ছে সাদা, কালো গরুর পাল। রাখাল বালকেরা গাছের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে। কোনো বালক চিৎ হয়ে শুয়ে হাতের লাঠিটা দিয়ে নিজের বুকেই বাজনা বাজাচ্ছে, যেন ঢাকের কাঠি।

রামচন্দ্র বসে আছেন থেলো হুঁকোটি হাতে নিয়ে। দ্রুত সময় মন্থর সকালটিকে দ্বিপ্রহরের দিকে নিয়ে চলেছে। যন্ত্র সভ্যতা এখনো এই গ্রামে প্রবেশ পথ পায়নি। মাত্র দুঘর ব্রাহ্মণ। এক এই মুখোপাধ্যায় পরিবার, আর ওই বন্দ্যোপাধ্যায়রা। মুখোপাধ্যায়দেরই দৌহিত্র বংশ। ছোট্ট গ্রামখানি পড়ে আছে আমোদরের তীরে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত খেলা করে যায়। বিশ্বাস, মণ্ডল, ঘোষ, সামুই উপাধিধারী কয়েক ঘর সদ্‌গোপ পরিবার। কয়েক ঘর গোয়ালা, একঘর নাপিত, একঘর ময়রা, একঘর কামার আর দুতিন ঘর বাগদী। এইসব নিয়ে শ-খানেক পরিবার। সামান্য মাটির ঘর এধারে, ওধারে। কারোরই তেমন প্রাচুর্য নেই। দিন চলে যায়। সদ্ভাব, সদ্ভাবনায়।

এই দালানটি রামচন্দ্রের প্রভাতী বৈঠকখানা। গ্রামের মানুষের মিলন কেন্দ্র। রামচন্দ্রের উদার আহ্বান — এসো, এসো, এক ছিলিম টেনে যাও। আরে কাজ! সে তো সকলেরই আছে। কাজ কি আর পড়ে থাকবে! তামাকের ধোঁয়া ঘুরপাক খাচ্ছে। সুবাস ছড়াচ্ছে। কত কথা, কত গল্প! একশ পরিবার যেন একটি পরিবার।

শুধু কি মানুষ! মানুষের দেবতারাও রয়েছেন মানুষেরই মতো অবস্থায়। খড়ের চালাই হল মন্দির। প্রথম যে চালাটি চোখে পড়ছে, ওইটিই মুখুজ্জে-বংশের প্রাচীন দেবালয়। একটি ঘরে আছেন, সপার্ষদ সুন্দরনারায়ণ — কূর্মাকৃতি ধর্মঠাকুর। পাশের ঘরটির নাম, 'কালী-নাড়ো'। মণ্ডপ শব্দটির অপভ্রংশ হল, কথ্য 'মাড়ো' শব্দটি। প্রতি বছর এখানে কালীপূজা হয়। আবার এইখানেই রোজ বসে পাঠশালা।

কালীমণ্ডপের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রাচীরের গায়ে একটি কালপাথর পড়ে আছে। গ্রামের মানুষের কাছে — এটি মা ষষ্ঠীর প্রতীক। প্রথা আছে — বিয়ের পর নববিবাহিত বরবধূ এখানে এসে প্রণাম করবে। রামচন্দ্রও শ্যামাসুন্দরীকে বিবাহ করে গৃহপ্রবেশের প্রাক্কালে এই প্রথাই পালন করেছিলেন।

পুণ্যপুকুরের ডানপাশ ধরে পায়ে চলা পথটি চলে গেছে মোড়লপাড়ার দিকে। ওখানে রয়েছেন মা সিংহবাহিনী, তাঁর দুই সঙ্গিনীকে নিয়ে। পাশেই রয়েছেন, মা মনসা। মুখুজ্যেরাই মায়ের পূজারী।

পুণ্যপুকুরের দক্ষিণে বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ি। এঁরা বেশ সম্পন্ন। ইটের তৈরি দেবালয়। বিশাল বৈঠকখানা। পয়সা আছে। সে ভাল। গ্রামে একঘর বড়লোক থাকা ভাল। পূজা-পার্বণ, উৎসব, মানুষের মিলন। রামচন্দ্র এইবার উঠবেন। সংসারের খবর নেবেন। স্নানাদি সেরে চলে যাবেন মন্দিরে।

এ বড় অপূর্ব গ্রাম। অভাব আছে বলেই শান্তি আছে। শহর এখনো অনেক দূরে।

ঝন্ ঝন্ শব্দ
কে গো, আমার মা কি এলি!

গ্রামের মানুষ একবাক্যে বলে রামচন্দ্রর পরিবারটি এ-গ্রামের দেবী। হৃদয়টা একবার দেখেছ! কি ভালবাসা! বিপদে-আপদে শ্যামাসুন্দরী। কেউ শুধু হাতে ফেরে না। দুপুরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবর নেয়, কেউ অভুক্ত আছে কি না। আজ কিছু জোটাতে পারনি! তা চলে এস আমার সঙ্গে, যা আছে ভাগ করে খাই। শ্যামাসুন্দরীর কথা বলতে বলতে চোখে জল এসে যায়।

রামচন্দ্র বললেন, 'তুমি যখন বাপের বাড়ি যাচ্ছ আমি বরং একবার কলকাতা ঘুরে আসি। সবাই বলছে, রাম, কলকাতায় না গেলে অভাব দূর হবে না। আমার তাই মনে হচ্ছে, বুঝলে?'

'কবে যাবে?'

'তুমি বেরিয়ে পড়, আমি সুবিধে মতো যাব।'

শিহড় গ্রামের উত্তর পাড়ায় শ্যামাসুন্দরীর বাপের বাড়ি। তিনি এলেন। যতই হোক বাপের বাড়িতে মেয়েদের স্বাধীনতা শ্বশুর বাড়ির চেয়েও বেশি। শৈশবের বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা হতে পারে। পাড়াপড়শিরা জিজ্ঞেস করবে, কি রে শ্যামা ছুটি পেলি? কদিন থাকবি? আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি যাওয়া-আসা।

পল্লীবাংলায় পানীয় জলের বড় সমস্যা। শ্যামাসুন্দরী উদরাময়ে আক্রান্ত হলেন। বাড়ির কিছু দূরেই একটি পুকুর আছে। পুকুরটির নাম এল্লাপুকুর। গভীর অন্ধকারে ওই পুকুর পাড়ে শৌচে গেলেন। ঠিক ঠাহর করতে না পেরে কুমাররা যে জায়গাটায় মাটির জিনিস রোদে দেয়, সেই পোয়ানের অদূরে একটি বেলগাছের তলায় বসে পড়লেন।

শীত শীত রাত। বসন্তকাল। থই থই অন্ধকার। সাপের ভয় আছে। ফুরফুর করে জোনাকি উড়ছে চারপাশে। বড় নির্জন। কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই। একটু ভয় ভয় ত করছেই। হঠাৎ পোয়ানের দিক থেকে ঝন্‌ঝন্‌ একটা শব্দ কানে এল। কেউ যেন ভারি ভারি মল পায়ে হাঁটছে। শ্যামাসুন্দরী হত চকিত। এ কিসের আওয়াজ! স্বয়ং নটরাজ কি আসছেন ত্রিশূল হাতে! কি হচ্ছে বোঝার আগেই বেলগাছের ডাল নড়ে উঠল। শ্যামাসুন্দরী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন একটি ছোট্ট মেয়ে তরতর করে নেমে আসছে। সে এসেই তার নরম নরম দুটি হাতে শ্যামাসুন্দরীর গলা জড়িয়ে ধরল। আহা! কি রূপ তার! পরনে লাল চেলী। পিঠের দিক থেকে শ্যামাসুন্দরীর গলা জড়িয়ে ধরে সুন্দরী মেয়েটি বলছে ' আমি তোমার ঘরে এলাম মা'। শ্যামাসুন্দরী তৎক্ষণাৎ অচৈতন্য হলেন।

বিল্ববৃক্ষ তলে তিনি জ্ঞানহারা। দেখ, দেখ, কোথায় গেল শ্যামা। লণ্ঠন হাতে সবাই খুঁজতে বেরলেন। এ কি অচৈতন্য! সবাই পরিচর্যা শুরু করলেন। সংজ্ঞা ফিরে এল। উঠে বসলেন তিনি। বেশ বুঝলেন, সেই মেয়েটি উদরে প্রবেশ করেছে। ভয়ানক ভারি হয়ে উঠেছে। এই অনুভূতির কথা তখনই কারোকে বললেন না। বেশ জানেন, সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু হল কি? কাকেই বা জিজ্ঞেস করেন!

এদিকে জয়রামবাটীতে কি হল। দুপুরবেলা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আহারাদির পর বিশ্রাম করছিলেন। বড় দুশ্চিন্তা। সংসার চালাবেন কি করে! রোজগার ত বাড়ছে না কিছুতেই। কতরকম চেষ্টাই ত হচ্ছে! টাকার বড় আকাল! ঠাকুর কবে তুমি মুখ তুলে চাইবে! এইসব ভাবতে, ভাবতে তাঁর সামান্য নিদ্রাকর্ষণ হয়েছে। দুপুরবেলাতেই স্বপ্ন দেখছেন। সোনার বরণ একটি বালিকা তাঁর পিঠের ওপর শুয়ে দুটি কোমল বাহু দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেছে। রামচন্দ্র দেখছেন, অসামান্য তার রূপ। স্বপ্নেই জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে মা? এত গয়নাগাঁটি পরে, এমন সুন্দর সাজে এসেছ? এ গ্রামে ত আগে কখনও দেখিনি! তুমি কে মা?'

বালিকা বড় স্নেহমাখা সুরেলা গলায় বললে, 'এই আমি তোমার কাছে এলুম গো।' বালিকা হাসছে আর বলছে। সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্রের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে শুয়ে রইলেন। তারপর উঠে বসে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে, ভাবতে মনে হল, স্বয়ং মা লক্ষ্মী এসেছিলেন। কৃপা করে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দর্শন দিয়ে গেলেন। কিন্তু কেন?

রামচন্দ্র বাইরের দাওয়ায় এসে বসলেন। বসন্তকাল। দখিনা বাতাস ছেড়েছে। কোকিলের ডাকে অপরাহ্ণ উতলা। বেলা যাই যাই করছে। রোদ গাছের মাথায় উঠেছে। রামচন্দ্র ভাবছেন— কলকাতায় তাহলে যেতেই হচ্ছে। মা যখন স্বপ্ন দিলেন, তখন বুঝতে হচ্ছে, কলকাতায় গেলে ভাগ্য খুলবে।

পরের দিনই তিনি কলকাতা যাত্রা করলেন। মাইলের হিসেবে কলকাতা আর কতদূর! কিন্তু পথ যে অতি দুর্গম। সহজে তর তর করে যে যাবে সে উপায় ত নেই। বেশিরভাগ কলকাতার যাত্রী যা করেন, প্রথমে কামারপুকুর তারপর বেঙ্গাই-চৌরাস্তা, কুমারগঞ্জ, একলকী, তারপর উচালনের পথ ধরে চটিতে, চটিতে বিশ্রাম নিতে. নিতে বর্ধমানে। বর্ধমান থেকে কলকাতার ট্রেন। উচালন থেকে বর্ধমান প্রায় ষোল মাইল। কামারপুকুর থেকেও ওই একই দূরত্ব। ধনীরা পালকিতে যান। গরুর গাড়িতে মাল চলাচল করে এই পথেই। পথে বড় দস্যুভয়। জীবনের আশঙ্কা।

আর একটি পথ আছে, সে-পথে কলকাতার দূরত্ব কিছুটা কমে। কামারপুকুর থেকে জাহানাবাদ বা আরামবাগ। তারপর তেলোভেলোর মাঠ পেরিয়ে তারকেশ্বর। সেখান থেকে কলকাতা। এ-পথ আরও ভয়াবহ। আরও বেশি ডাকাতির ভয়। বর্ষাকালে পথ অতি দুর্গম হয়। তখন অনেকে গহনার নৌকো ধরেন আরামবাগ থেকে। তারপর রানীচক, কোলাঘাট হয়ে কলকাতা।

এইবার কলকাতার কাজ সেরে ফিরে আসা। কলকাতা থেকে ট্রেনে বিষ্ণুপুর। সেখান থেকে বাসে কোতুলপুর, কোয়ালপাড়া, দেশড়া হয়ে জয়রামবাটী! খরচ বেশি। বর্ষকালে বাস কোতুলপুরের বেশি আর যাবে না। তখন গরুর গাড়ি অথবা হেঁটে। পদযানই শ্রেষ্ঠ যান।

ছোটলাইনে ট্রেন চলে। কলকাতা-চাঁপাডাঙ্গা লাইন। চাঁপাডাঙ্গা থেকে বর্ষাকাল ছাড়া অন্য ঋতুতে মোটরে আরামবাগ। আরামবাগ থেকে জয়রামবাটী

আন্দাজ এগার মাইল। রামচন্দ্র প্রথম পথেই কলকাতা চললেন। সবাই একই কথা বলছে — কলকাতায় কোম্পানির টাকা প্রজাপতির মতো উড়ছে। ধরতে পারলেই বড়লোক। এই ত কামারপুকুর থেকে অনেক ব্রাহ্মণ এঁদো গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে গিয়ে বেশ অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছেন। সেখানে সব রাজা-মহারাজার বাস। সব বাড়িতেই গৃহদেবতা আছেন। যাঁরা সংস্কৃত জানেন তাঁরা টোল খুলছেন।

শ্যামাসুন্দরী কয়েকদিন পরেই শ্বশুরবাড়ি ফিরে এলেন। তাঁর ছুটি শেষ। রামচন্দ্রের পরে আর তিনটি ভাই আছেন, ত্রৈলোক্যনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র ও নীলমাধব। সংসার ত খুব ছোট নয়। শ্যামাসুন্দরীর দায়িত্ব অনেক। নিজেদের যে-টুকু ধানজমি আছে, তাতে যা ধান হয়, সংসার চলে না। রামচন্দ্র বুদ্ধি করে তুলোর চাষও করেন। ফলন খুব খারাপ নয়।

ইতিহাস ত এইরকম, বসোরার যেমন গোলাপ, হিমালয়ের যেমন দেবদারু, বস্ত্রবয়ন শিল্প তেমনই বঙ্গের নিজস্ব। এদেশে এককালে চরকা মেয়েদের হাতের অপরিহার্য অস্ত্র ছিল, যেমন বিষ্ণুর হাতের সুদর্শনচক্র। অতীতে কি রাজরানী, কি দীন রমনী সকলেই চরকায় সুতো কাটতেন। বাঙলার পল্লীতে, পল্লীতে, ঘরে ঘরে দিবা দ্বিপ্রহরে ভোঁ ভোঁ ভোমরার শব্দ। সে আর কিছুই নয়, চরকার চাকা ঘুরছে। দাওয়ায় বসে মেয়েরা সুতো কাটছে। পান আছে, দোক্তা আছে, খোস গল্প আছে। দুপুরের গ্রাম যেন নেশার গ্রাম। গাছের ডালে মৌচাক। মৌমাছির ভন ভন। হলুদ, হলুদ বউ কথা কও পাখির সেই একই আবেদন — বউ! কথা কও। মাছ রাঙার সেই এক ধান্দা। বেলা পড়ে আসছে যে। ঠোঁটে একটা কিছু নিয়ে বাসায় ফিরতে হবে ত।

মাঝে, মাঝে গ্রামের পথ ধরে হঠাৎ কোনও বৈষ্ণবের আগমন। মায়েদের গান শোনাবেন —

(সে হাটে) বিকায় নাকো অন্য সুতো।
বিনা তাঁতি নন্দের সুত॥
সে হাটের প্রধান তাঁতি, প্রজাপতি পশুপতি,
আর যত আছে তাঁতি তাদের শুধু যাতায়াত॥

শ্যামাসুন্দরীর চরকা আছে। চাষের তুলোয় পৈতের সুতো কাটেন। পাশে এক ধামা তুলো, যেন এক ধামা খরগোস। হাত বটে! মাকড়সার জালের

মতো সূক্ষ্ম সুতো বেরিয়ে আসছে। সূক্ষ্ম কিন্তু শক্ত। একটা পৈতেয় তিনটি দণ্ডী থাকে। এইরকম চারটে পৈতে একটা বড় এলাচের খোলে ঢুকে যাবে। চারটে পৈতেতে প্রায় দুশো চল্লিশ হাত সুতো ত থাকবেই।

রামচন্দ্র কলকাতা থেকে ফিরে এলেন। শুভ সংবাদ তেমন কিছু আনতে পারেননি। সেখানে তাঁর কেই বা আছে যে, এক কথায় ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে! বাড়ি ফিরেই প্রথমে যা লক্ষ্য করলেন, স্ত্রীর চেহারার রূপান্তর। রূপ যেন ফেটে পড়ছে। মাথায় চুল যেন আর ধরে না। এমন কি করে হল! বাপের বাড়িতে কি এমন খাতির!

রাত্তির বেলা একান্তে শ্যামাসুন্দরীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার বল তো! এমন রূপসী হলে কি করে?'

শ্যামাসুন্দরী বললেন, 'তা হলে শোন।'

শিহড়ের সমস্ত ঘটনা স্বামীকে বললেন। রামচন্দ্র অবাক হলেন। ওই একই সময়ে তিনিও ত স্বপ্ন পেয়েছেন! শয্যায় উঠে বসে বললেন, 'এ ত বোধন! মা আসছেন। তোমার দেহ এখন দেবালয়। আমি তোমাকে আর স্পর্শ করব না।'

ভক্ত ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র স্ত্রীকে দেবীজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে লাগলেন। দুজনেই ভোগসুখে উদাসীন হলেন। দেবী আসছেন। শুদ্ধ চিত্তে, পবিত্র দেহে তাঁকে বরণ করে নিতে হবে। কোন লগ্নে, কখন তিনি আসবেন, তিনিই জানেন।

যথাসময়ে প্রথা অনুযায়ী 'সাধভক্ষণ' অনুষ্ঠান পালিত হল। শ্যামাসুন্দরী অবাক। যাঁরা এলেন তাঁদের দেওয়া শাড়িতে ঘর ভরে গেল। এত শাড়ি। রামচন্দ্র বললেন, 'দেখেছ বউ, গ্রামের মানুষ তোমাকে কত ভালবাসে?'

'সে তোমাকে ভালবাসে বলেই আমাকে বাসে।'

'না গো তা নয়। ভালবাসে তোমার স্বভাবের জন্যে। মানুষের বিপদে-আপদে তোমার মতো কে এগিয়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে পারে। আমি জানি অনেক দিন তোমার খাওয়া হয় না। অন্যকে খাইয়ে দাও।'

'ওসব কথা থাক। ও কিছু নয়। আমি যা আমি তাই।'

'তাই তোমার নাম শ্যামা।'

এদিকে হেমন্ত শেষ হয়ে এল। ভোরের কুয়াশায় চুপি চুপি শীত আসছে। বড় ভাল সময়। চারপাশ শুকনো খটখটে। সব ফসল কাটা হয়ে গেছে।

মরাই ভরে গেছে ধানে। রোজ রাতে সাদা ধবধবে একটি লক্ষ্মী প্যাঁচা রামচন্দ্রের মরাইয়ের মাথায় এসে বসে। সাঁঝের বাতাসে নতুন ধানের গন্ধ ভেসে বেড়ায়। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, বাস্তু সাপ বেরলো নাকি! ওরে অন্ধকারে বেরচ্ছিস, হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে যা।

পৌষপার্বণ এসে গেল। বামনি বাঁধতে হবে। নতুন ধান্যে হবে নবান্ন। পয়রা গুড় বাজারে নেমেছে। আমোদরের স্বচ্ছ জল আরো স্বচ্ছ হয়েছে। মাছেদের রুপলি চিক্‌চিক্ চোখে পড়ে। বালকদের ঝাঁপাই ঝোড়া বন্ধ। তারা সব দোলাই বেঁধে মাঠেমাঠে রোদ পোহাচ্ছে।

জয়রামবাটীর ক্ষেত্র শুধু পড়ে থাকে না। রবিশস্যে সব সবুজ হয়ে উঠেছে। এদিকে শাস্ত্রমতে দক্ষিণায়ণের শেষে উত্তরায়ণে স্বর্গের দেবতারা জাগছেন। মুলো হাতে সবাই পৌষকালী দর্শনে যাচ্ছেন। কলকাতায় এখন বড়দিনের সাজসাজ রব। সব ধর্মমতেই এই সময় নানা রকমের উৎসব। এ অতি উত্তম সময়। খেয়ে সুখ, ঘুমিয়ে সুখ, বেড়িয়ে সুখ। রামচন্দ্রের তামাকের খরচ বেড়ে গেছে। সকালে দাওয়ার আসর এই সময়টায় লম্বা হয়ে যায়। কত রকমের গল্প! কুইনের গল্প। রাজা, মহারাজাদের গল্প। বড়লোকের বাড়ি নিমন্ত্রণ খাওয়ার গল্প। সায়েবদের বাঘ শিকারের গল্প। যত গল্প তত ধোঁয়া।

দাই ঘোষণা করলেন, আজকের রাতটা সজাগ থাকতে হবে। মনে হচ্ছে ভোরের আগেই কান্না শুনতে পাব। ['আজ রাতে আমার মা কাঁদবেন। সে-কান্না কোনওদিন থামবে না। শত শত পুত্রের জননীর চোখের জল শুকোয় না কি? পৃথিবীর তিনের চার ভাগই ত কান্না। তা না হলে সাত সমুদ্র তের নদী এল কোথা থেকে।] সূর্য গেলেন অস্তাচলে। ঘরে ঘরে শাঁখ বাজল। সন্ধ্যার আগমনী। দেবদেউলে প্রদীপ জ্বলল। গৃহস্থের আবাসে সাঁঝের বাতি। আর একটু পরেই জয়রামবাটী নিদ্রার আচ্ছাদনে প্রবেশ করবে।

১৮৫৩ সাল। ২২ ডিসেম্বর। বৃহস্পতিবার। মায়ের বার। কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। গোয়ালে গরুদের গায়ে চট উঠেছে। উনুনের ধারে বেড়াল বসেছে থুপ্পি হয়ে একটু উত্তাপের আশায়।

রামচন্দ্রের আবাসে হঠাৎ শোনা গেল সদ্যোজাতকের কান্না' রামচন্দ্র সময় দেখলেন, রাত্রি দুই দণ্ড নয় পল। তিথি, কৃষ্ণা সপ্তমী। শাঁখ বাজাও,

শাঁখ। শঙ্খের শব্দ গৃহাঙ্গন পেরিয়ে লোকালয়ে ছড়িয়ে পড়ল। এ ত বারের পুজোর শঙ্খরব নয়। রামচন্দ্রের বাড়িতে নতুন প্রাণের আবির্ভাব। রামচন্দ্রের প্রথম সন্তান।

সকালবেলা সকলের আগমন। দেখি গো। কে এলে গো! মায়ের কোলের কাছটিতে কেমন শুয়ে আছে! কাপড়ের একটি পুঁটলি। এই এতটুকু। ছোট্ট একটি মুখ, লাল টকটকে। এখনই মাথায় কত চুল দেখেছ দিদি! [এরপর ত সেই ছবিটি দেখবে। ঘরে ঘরে। আইরিশ মেয়ে মার্গারেট, ভারতীয় নাম নিবেদিতা যে-ছবিটি তুলিয়েছিলেন। কাঁধের ওপর দিয়ে একগুচ্ছ চুল সামনে চলে এসেছে। শুভ্র বস্ত্র। স্থির দুটি চোখে জগতের মায়া জড়ান] লক্ষ্মীবারে মা লক্ষ্মী এলেন রামচন্দ্রের কুটীরে।

প্রবীণরা বলতে লাগলেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যারাতে কন্যাসন্তান, অতি শুভ। দেখ না কি হয়! একজন বললেন, আমার মন বলছে এই গ্রামের চেহারা পালটে যাবে। পিতা রামচন্দ্রের হুঁকো বড় তৃপ্তিতে গুড়ুড়, গুড়ুড় করছে। অম্বুরি তামাকের গন্ধে উঠান ভরে গেছে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা এক বাড়ল।

শীত গেল। বসন্ত গেল। গ্রীষ্ম এল। শ্যামাসুন্দরীর কন্যাটির চোখ ফুটেছে। মানুষের মুখ চিনতে পারে। লক্ষ্মী ত সত্যিই লক্ষ্মী। কান্নাকাটি নেই। শুইয়ে দিলে শুয়েই থাকে। নিজের হাত নিয়ে খেলা করে। কেউ কথা বললে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। গাল ভরা হাসি।

শ্যামাসুন্দরী কর্মঠ মানুষ। সংসারের যত কাজ সব একা হাতে করেন। বড় পরিচ্ছন্ন। ঘর-দোর সব ছবির মতো সাজান। ঝকঝকে, তকতকে। যেখানকার জিনিস ঠিক সেইখানে। ভাঁড়ার পরিপূর্ণ। শ্যামাসুন্দরী সামান্য আয়ে সংসার চালাবার কায়দা জানেন। সেই কায়দাটা হল, অপচয় নিবারণ। ইংরেজরা যেমন বলেন, ওয়েস্ট নট ওয়ান্ট নট।

কোলের মেয়েকে নিয়েই শ্যামাসুন্দরী তুলোর ক্ষেতে যান। কার্পাসের গাছ তুলোয় ফেটে পড়ছে। একটি পরিচ্ছন্ন ছায়াশীতল জায়গায় চাটাই পেতে কাঁথা বিছিয়ে সারদাকে শুইয়ে দেন। চারপাশে কার্পাস। সাদা সাদা তুলো বাতাসে দুলছে। প্রকৃতি যেন ছোট্ট মেয়েটিকে বেড় দিয়ে রেখেছে। মাথার ওপর ছলছলে নীল আকাশ। অনেক উঁচুতে চিল ঘুরপাক খাচ্ছে। শালিকের ঝাঁক নেমেছে ছোট্ট মেয়ে সারদাকে ছড়া শোনাতে। ছোট ছোট

গোল গোল দুটি হাতে নোয়া পরান। চোখে মনসাপাতার কাজলের টান। কপালে কাজলের টিপ। মাটির শয্যায় ছোট্ট মা। মাঝে মাঝে শব্দ করে হেসে উঠছে। মেয়েকে শুইয়ে রেখে শ্যামাসুন্দরী তুলো তুলছেন। তুলোর রোঁয়া বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্ছে।

আমোদরে স্নানে যাওয়ার পথে বউঝিরা শ্যামাসুন্দরীর খবর নিয়ে যাচ্ছেন। মেয়েটাকে ক্ষেতের মধ্যে শুইয়ে রেখেছ? পিঁপড়ে, পোকামাকড়! কিছু হবে না ত? শ্যামাসুন্দরীর গভীর বিশ্বাস, মায়ের নাম করে মায়ের কোলে মাকে শুইয়ে রেখেছি। সাধ করে গরিবের ঘরে এলে কেন? বড়লোকের কি অভাব ছিল?

হ্যাঁ গো। মেয়ের নাম কি রাখলে?

যে-নাম রেখেছিলুম সে-নামটা আমার বোনকে দিয়ে দিলুম।

সে আবার কি? তুমি ত এমনিই সব দিয়ে দাও, শেষে মেয়ের নামটাও।

ওই যে, ইচ্ছে হল মেয়ের নাম রাখি ক্ষেমঙ্করী। ক্ষেমঙ্করী কি সুন্দর নাম! তা আমার বোন এসে বললে, দিদি, নামটা আমাকে দিয়ে দে, তার বদলে তোকে আমি আর একটা সুন্দর নাম দিচ্ছি।

সঙ্গে, সঙ্গে দিয়ে দিলে।

আমার চোখে যে জল এসে গেল। বোন বললে, তোর মেয়েটা আমার মেয়েটা মারা যাবার পরেই হল। তার কথা যে আজও ভুলতে পারিনি দিদি। তার নাম রেখেছিলুম, সারদা। নামটা ফেলে রেখে গেছে। তোর মেয়ের নাম রাখ সারদা। তাহলে আমি মনে করব আমার সারদাই তোর কাছে এসেছে। আমি ওকে দেখে ভুলে থাকব।

তুলোর ক্ষেতে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছে দুজনে। তুলোর চেয়ে নরম শ্যামাসুন্দরীর মন। মানুষ তুলোর বিছানায় শোয়। সে আর কতটুকু। সারদা শুয়ে আছে তুলোর ক্ষেতে। আকাশের নীল ছায়া ফেলেছে রাঙা মুখে। নানা রঙের প্রজাপতি চারপাশে উড়ে উড়ে পাহারা দিচ্ছে।

আর কিছু পরেই শ্যামাসুন্দরী ঘরে ফিরবেন মেয়েটিকে বুকে করে। পিঠের দিকে ঝুলবে তুলোর বোঝা। রামচন্দ্র এখন মন্দিরে। পূজায় ব্যস্ত। শ্যামাসুন্দরী এতটাই স্বাবলম্বী, কারো পরোয়া করেন না। তাঁর মুখে সদাসর্বদা এমন এক প্রসন্নতা মানুষ তাকালেই জীবনের সব সমস্যা কিছুক্ষণের জন্যে

ভুলে যায়। অভাব! সে ত গ্রামবাংলার মানুষের চিরসাথী। অভাবের মধ্যেই ধর্ম আছেন, ত্যাগ আর আদর্শের আলোয় দেখতে হয়।

রামচন্দ্র ফিরলেন। হাতে একটি পুঁটলি। আজ কোনো যজমানবাড়িতে কাজ ছিল। ধুতি, শাড়ি, খড়ম, ছাতা ইত্যাদি পেয়েছেন। শ্যামাসুন্দরী কলমিশাক তুলে এনেছেন। বাছা, ধোওয়া চলেছে। রামচন্দ্র বললেন, পুঁটলিটা খুলে দেখ, সিধে দিয়েছে। তরি-তরকারি কিছু আছে। এই দুনিয়ায় সবই পাওয়া যায়, আমপাতা, জামপাতা, কলাপাতা। পাওয়া যায় না পয়সা। পয়সার বড় অভাব। ভাবলুম কপাল বুঝি ফিরবে! কোথায় কি?

শ্যামাসুন্দরী কুটনো কুটতে কুটতে বললেন, আমাদের কপাল কি এমন খারাপ! গ্রামটা একবার ঘুরে এস। বুঝতে পারবে আমরা কত ভাল আছি।

রামচন্দ্র হুঁকো হাতে দাওয়ায় গিয়ে বসলেন। ভাবতে লাগলেন, পয়সা থাকলে বেশ একটা দাপট থাকে। লোকমান্য হওয়া যায়। এর বেশি আর কি হয়! গুচ্ছের মোসায়েব এসে জোটে। ভাবে তন্ময় হয়েছিলেন। পিঠের ওপর ছোট্ট ছোট্ট দুটি হাতের স্পর্শে ফিরে তাকালেন। সারদা হামা দিতে শিখেছে। কখন চলে এসেছে চুপিচুপি। পিঠে ধরে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে! রামচন্দ্র হুঁকো রেখে মেয়েকে কোলে নিলেন। সারদার সঙ্গে কথা বলছেন, হাঁটি, হাঁটি, পা, পা। আর কি! এইবার হাঁটতে শিখবে। ওইদিকে আমোদর। আমরা বেড়াতে যাব। শিহড়ে মামার বাড়ি যাব। আরও বড় হলে তেলোভেলোর মাঠ পেরিয়ে আমরা তারকেশ্বর যাব। তারপরে হাঁটতে, হাঁটতে আমরা কলকাতায় যাব। সেখানে আমোদর গঙ্গা নয় আসল গঙ্গায় চান করব। কালীঘাটে মা কালী দর্শন করব। এই ত, আর একটু বড় হলেই সব হবে। আর কটা বছর।

ছোট্ট মেয়ে সারদা গল্প শুনতে শুনতে বাবার কোলে ঘুমিয়ে পড়ল। বড় লক্ষ্মী মেয়ে। কোনো বায়না নেই, কান্না নেই। রামচন্দ্র মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। ভবিষ্যৎ পড়ার চেষ্টা করছেন। মেয়েদের জীবন। পরাধীন জীবন!

চারিধারে বৃক্ষলতা অতি মনোরম।
যেন মহা তপঃপর ঋষির আশ্রম।।

মাত্র তিন মাইল। আমোদর পার হয়ে অমরপুরের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যাব কামারপুকুর। এপারে বাঁকুড়া, ওপারে হুগলী। মাটি বদলে গেল। এদিকে কাঁকর ওদিকে মিহি। জয়রামবাটীর রামচন্দ্র, শ্যামাসুন্দরী। কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রমণি দেবী। সব কেতাবেরই যেমন দুটি মলাট। দুই মলাটের মাঝখানে যত কাহিনী।

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় কি বিশাল কোনো ব্যক্তি! অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি! না। নিঃস্ব ব্রাহ্মণ। তাহলে? তাহলে একালের মানুষ সেকালের ওই মানুষটিকে কেন মনে রেখেছে? কত ত এল গেল! কালের বুদবুদ কালের স্রোতেই মিলিয়ে গেল। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় কে এমন? চরিত্র। যারা একটু, একটু মানুষ, তারা বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে করতেই মরে যায়। ক্ষুদিরাম ছিলেন পরিপূর্ণ মানুষ। সম্পূর্ণ মানুষ। দেবতা নয়? না। পরিপূর্ণ মানুষের কাছে দেবতারাও ম্লান। দেবতারা কল্পনা, মানুষ হল বাস্তব। দেবতাদের জীবনে সংগ্রাম নেই, মানুষের জীবনে ঠাসা সংগ্রাম।

রিক্ততার ঐশ্বর্য দেবতার ঐশ্বর্যকে হার মানায়। আছে বললে, মাপতে হয়। কি আছে! কতটা আছে? নেই বললে, অনন্ত, অসীম। সেই কারণেই ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এক অত্যাচারী জমিদারের দাঁত ভেঙে দিয়েছিলেন। সেই জমিদারের নাম ছিল রামানন্দ রায়।

হুগলীজেলার দেরেগ্রামে এক অবস্থাপন্ন চট্টোপাধ্যায় পরিবারে ক্ষুদিরামের জন্ম। তাঁর পিতার নাম মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়। ধর্মনিষ্ঠ, সদাচারী, কুলীন, শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। শিবালয় সমন্বিত পুষ্করিণী। সেই পুষ্করিণী দেরেগ্রামে 'চাটুজ্যেপুকুর' নামে পরিচিত ছিল। মানিকরামের তিন পুত্র ও এক কন্যা। ক্ষুদিরাম জ্যেষ্ঠপুত্র। তারপরে বোন রামশীলা। তারপর দুই ভাই — নিধিরাম, কানাইরাম।

ক্ষুদিরাম অতি সুদর্শন ছিলেন। লম্বা, সবল, ছিপছিপে, ফর্সা। ব্রাহ্মণের সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারী -- সত্যনিষ্ঠা, সন্তোষ, ক্ষমা, ত্যাগ। রোজ সকালে নিজে ফুল তুলে রঘুবীরের পূজা করে তবে জলগ্রহণ করতেন। তাঁর চরিত্রের জন্যে সমস্ত মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন।

পিতার মৃত্যুর পর বিষয় সম্পত্তি, সংসারের দায়িত্ব ক্ষুদিরামকেই নিতে হল। বিবাহ করলেন। অল্প বয়সেই স্ত্রী মারা গেলেন। দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন। সরাটিমায়াপুর গ্রামের চন্দ্রমণিকে। সুন্দরী। ভারি সরল। ভগবান বিশ্বাসী। পরিবারে তিনি পরিচিত হলেন 'চন্দ্রা' নামে। এঁদের প্রথম পুত্রসন্তানের নাম রামকুমার। পাঁচ বছর পরে কন্যা কাত্যায়নী। এইবার একটি ওলটপালট। ধর্ম চাইলেন ধার্মিকের পরীক্ষা।

জমিদার রামানন্দ রায়। তিনটি গ্রামের মালিক, সাতবেড়ে, নারায়ণপুর ও দেরে। তিনি থাকতেন সাতবেড়েতে। মারাত্মক জমিদার। মানুষের সর্বনাশ করার জন্যেই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রায়জমিদার একদিন ক্ষুদিরামকে সেরেস্তায় ডেকে পাঠালেন। বসুন। সবাই বলে আপনি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির। আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। আপনাদের গ্রামের একজনকে আমি কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে চাই। বেয়াদপটার নামে একটা মামলা রুজু করেছি।

ক্ষুদিরাম মিতভাষী মানুষ। তিনি বললেন, আমি কি করব?

সে কি? বুঝতে পারছেন না? এ মামলায় আপনিই ত আমার সব, তুরুপের তাস। মামলাটা মিথ্যে। আপনার সাক্ষ্যে মিথ্যা সত্য হবে। কেন হবে? আপনি ধার্মিক, সত্যবাদী। এ কথা সবাই জানে। আপনার কথা হাকিম

মানবে। চালটা বুঝলেন? যুধিষ্ঠিরও মিথ্যে কথা বলেছিলেন। তাহলে এই কথাই রইল।

ক্ষুদিরাম উঠে দাঁড়ালেন।

রামানন্দ বললেন, তাহলে এই কথাই রইল। আমার লোক গিয়ে তারিখ জানিয়ে আসবে। আপনাকে নিয়েও যাবে। কি বলতে হবে আমার উকিল শিখিয়ে দেবে। আপনিও শুকনো ফিরবেন না। সংসারী মানুষ। আপনাকে খুশি করে দোবো। লোকে আমাকে বদলোক বলে, আমার সঙ্গে কাজ করলে বুঝবেন, আমি কেমন লোক।

ক্ষুদিরাম বললেন, মাপ করবেন। আইন-আদালতকে আমি ভীষণ ভয় পাই। আর মিথ্যে কথা আমি বলতে পারব না, জীবন গেলেও নয়।

রায় জমিদার একটু থমকে থেকে বললেন, আমি কে জানেন ত!

ক্ষুদিরাম বললেন, জানি।

জমিদার বললেন, কিছুই জানেন না, এইবার জানবেন। প্রাণে মারব না, ভাতে মারব। বউ, ছেলেমেয়ে নিয়ে রাস্তায়, রাস্তায় ভিক্ষে করতে হবে। দেখি ধর্ম কি করে রক্ষা করে।

ক্ষুদিরাম উৎকণ্ঠায় সারারাত জেগে কাটালেন। চন্দ্রমণি জিজ্ঞেস করলেন, কি এমন হল। জমিদার তোমাকে কি বললে এমন!

ক্ষুদিরাম বললেন, চন্দ্রা, আর কটা দিন। ওই চাটুজ্যে পুকুর, শিবালয়, এই জমিজমা, ভিটেমাটি সবাই চলে যাবে। পথের ভিখিরি।

কেন, কি করেছি আমরা?

জমিদারের কোপ। রামানন্দ রায় হল রাহু। রাহুগ্রাসে সব যাবে।

তাই হল। মিথ্যে মামলা সাজালেন রামানন্দ। যথারীতি ডিক্রি পেলেন। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পৈতৃক সম্পত্তি নিলামে চড়ল। গ্রামের মানুষ অত্যাচারী জমিদারের ভয়ে নীরব দর্শক। নিঃস্ব ক্ষুদিরাম। পথের ভিখারি।

তাহলে রঘুবীর কি করলেন? তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তকে রক্ষা করতে পারলেন না! ক্ষুদিরাম নিজের উপার্জনে পৈতৃক সম্পত্তি অনেক বাড়িয়েছিলেন। এক কোপে সব সাবাড়। তিনি কিন্তু টললেন না। কোনও ক্ষোভ নেই, প্রতিবাদ নেই। রঘুবীর ভরসা। রঘুবীরকে তাহলে ব্যবস্থা একটা করতেই হয়। কি ভাবে করবেন?

ক্ষুদিরামের পরিবারকে পূর্বদিকে নিয়ে যাবেন। এক ক্রোশ পূবে ভারি সুন্দর একটি গ্রাম আছে। গ্রামটির নাম কামারপুকুর। ওই গ্রামেই আমি দৃশ্যপট সাজাতে চাই। একটা ভবিষ্যত আসছে ক্ষুদিরাম। তুমি জান না। তুমি আমার ছকের ঘুঁটি। আমার একটা পথ চাই, যে-পথ চলে গেছে শ্রীক্ষেত্রে। সেই পথের ধারে একটি গ্রাম। সেই গ্রামের একটা ইতিহাস থাকবে। বিশাল একটি আমবাগান চাই। তার নামটির মধ্যে থাকবে রূপকথা, 'মানিক রাজার আম্রকানন'। দুটি দীঘি চাই। যার নামে থাকবে কবিতা — 'সুখসায়ের', 'হাতিসায়ের'। বৃহৎ একটি পুকুর চাই যার নাম হবে 'হালদারপুকুর'। দুটি শ্মশান চাই, একটি ঈশান কোণে, আর একটি বায়ুকোণে। অদ্ভুত নাম — 'বুধুই মোড়ল' আর 'ভূতীর খাল।'

ক্ষুদিরাম! দেরেগ্রামে কি তাকে আনা যায়। সে যে কবি! তার বিচরণের জন্যে একটা পরিসর চাই, প্রকৃতি চাই, ইতিহাস চাই। মানুষের মতো মানুষ চাই। গৃহী চাই, সন্ত চাই, রঙ্গ রসিকতা চাই। বাল্যসঙ্গী চাই। পরে, আরও অনেক পরে তিনি আসতে চাইবেন, তুমি দুয়ার খুলে তাঁকে আবাহন জানাবে। তারপর তুমি ফিরে আসবে আমার কাছে। কাল চলতে থাকবে, চলতেই থাকবে বহতা পানির মতো।

ত্রিকোণমণ্ডল। তিনটি গ্রামের একটি ত্রিভুজ। শ্রীপুর, কামারপুকুর, মুকুন্দপুর। পৃথক হলেও ঘনিষ্ঠ। যেন একই গ্রামের বিভিন্ন পল্লী। তিনটি গ্রামের একটিই নাম — কামারপুকুর। স্থানীয় সব জমিদারদেরই বসবাস কামারপুকুরে। কামারপুকুর বর্ধমান মহারাজার গুরুবংশীয়দের লাখরাজ জমিদারিভুক্ত ছিল। তাঁদেরই বংশধর গোপীলাল, সুখলাল গোস্বামী কামারপুকুরে ওই সময়ে বসবাস করছিলেন। গোপীলাল গোপেশ্বর নামক বৃহৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। গোপীলালের উত্তরপুরুষ সুখলাল।

সুখলাল গোস্বামীর সঙ্গে ক্ষুদিরামের খুব বন্ধুত্ব ছিল। দুজনেই সমস্বভাবের। প্রায় একই রকম দেখতে। ভগবানকে নিয়েই থাকেন। ভগবানের ক্ষেত্রই তাঁদের বিচরণ ভূমি। রামানন্দ নামের আগে রামকে পেয়েছিলেন, মর্ম বোঝেননি। ভিটেয় ঘুঘু চরাণতেই তাঁর আনন্দ। সুখলাল খবর পেলেন, বন্ধু ক্ষুদিরাম বিপন্ন। আশ্রয়হীন। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠালেন, বন্ধু! আমি আছি। চলে এস আমার কাছে।

সুখলাল নিজের বাসস্থানের একাংশের কয়েকটি চালাঘর চিরকালের জন্যে বন্ধু ক্ষুদিরামকে ছেড়ে দিলেন, শুধু তাই নয় সংসারের খরচ চালাবার জন্যে এক বিঘা দশ ছটাক জমিও দিলেন। এই দুনিয়া অতি বিচিত্র স্থান। রামানন্দ যেমন আছেন সেইরকম সুখলালও আছেন। ম্যালেরিয়াও আছে কুইনিনও আছে।

কামারপুকুর কি কম জায়গা। উর্বর জমি। যেমন ধান, তেমন রবিশস্য। ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পেও কম যায় না। আবলুস কাঠের হুঁকোর নল তৈরিতে এক নম্বর। সরাসরি কলকাতার সঙ্গে কারবার। সুতো, গামছা আর কাপড় তৈরিতে কামারপুকুর পেছিয়ে নেই। বিখ্যাত কয়েকজন বস্ত্রব্যবসায়ী কামারপুকুরে। এঁদের মধ্যে একজনের নাম বিষ্ণু চাপড়ি। এঁরা সরাসরি কলকাতার সঙ্গে ব্যবসা করতেন।

সপ্তাহে দু'দিন কামারপুকুরে বড় হাট বসে — শনি, মঙ্গলবারে। তারাহাট, বদনগঞ্জ, শিহড়, দেশড়া — এইসব গ্রাম থেকে যতরকমের জিনিস আসে। সুতো ত আসবেই আর আসবে নানা রকমের কাপড়, গামছা, হাঁড়ি, কলসী, কুলো, ধুচুনি, চেঙ্গারী, মাদুর, চাটাই। সংসারের নানা জিনিস, শাকসবজি, তরিতরকারি। বিশাল সে জমায়েত।

কামারপুকুর উদার গ্রাম। পয়সা আছে, মানুষ আছে সেই সঙ্গে আছে প্রবল ধর্ম। সংসারকে ঘিরে দুঃখ-যন্ত্রণা। ধর্মকে ঘিরে আনন্দ, উৎসব। চৈত্রমাসে মনসা পূজা, শিবের গাজন। বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠে চব্বিশ প্রহর হরিনাম। এছাড়া জমিদার বাড়িতে বারমাসে তের পার্বণ।

কামারপুকুরের কোনো ইতিহাস আছে, না নেহাতই একটা গ্রাম?

পুরী যাওয়ার পথ গেছে এই গ্রামের ভেতর দিয়ে। কত সাধু-সন্ত, কত সম্প্রদায়ের সাধু, লাহাবাবুদের পান্থনিবাসে কিছুকাল অবস্থান করে, গ্রামকে পবিত্র করে আবার আবার যাত্রাপথের যাত্রী হন।

এই যে মানিরাজা, মানিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশাল ধনীমানুষ। তেমনি তাঁর দানধ্যান। তাঁর বাড়িতে লক্ষ ব্রাহ্মণ বহুবার নিমন্ত্রিত হয়ে ভোজন করেছেন। কামারপুকুরের অগ্নিকোণে মান্দারণ গ্রাম। সেখানে ইতিহাস ভেঙে পড়ে আছে। পাঠান অধিকারের সময় এখানে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। যার নাম হয়েছিল গড়মান্দারণ। ভগ্ন তোরণ, স্তূপ, পরিখায় লেগে আছে সেই দূর অতীতের শ্যাওলা। অশ্বারোহী সময় এইসব ফেলে রেখে কোন দিগন্তে

উধাও হয়ে গেছে। সেকালের সেই শাসকদের অদ্ভুত সব কৌশল জানা ছিল। অদূরে প্রবাহিত আমোদর নদের গতি পরিবর্তন করিয়ে দুর্গের পরিখায় পরিণত করা হয়েছিল। দুর্গের অল্প দূরে শৈলেশ্বর শিবের মন্দির।

বর্ধমান থেকে একটি পাকা রাস্তা এদিকে বত্রিশ মাইল চলে এসে গড়মান্দরণকে বেড় দিয়ে, কামারপুকুরকে অর্ধবেষ্টন করে চলে গেছে পুরী। পথের দুধারে বড় বড় দীঘি। গড়মান্দারণের ন'ক্রোশ উত্তরে উচালন। সবচেয়ে বড় দীঘিটি ওই গ্রামেই। ওখানে একটি হস্তিশালার ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। এই পথেই আছে সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থান মোগলমারির যুদ্ধক্ষেত্র।

তাহলে সিদ্ধান্ত এই — দেরেগ্রামের চেয়ে কামারপুকুর অনেক উন্নত। আসবেন একজন। নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিলেন। নদীর এপার, ওপার। কামারপুকুর, জয়রামবাটী। দৃশ্য সেতু নয়, অদৃশ্য একটি মহাসেতু তৈরি হবে। তলায় প্রবাহিত হবে ভুগোলের নদী নয়। চিরকালের মানুষের আধ্যাত্মিকতার ধারা। দুটি পাড় — রামকৃষ্ণ, সারদা। প্রবাহ, নরেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ।

ক্ষুদিরাম রামচন্দ্রকে চেনেন না। রামচন্দ্র ক্ষুদিরামের নাম অবশ্যই শুনে থাকবেন। ক্ষুদিরাম বিদ্রোহী। সত্য আর অসত্যের চিরকালীন সংঘাতে তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে প্রোজ্জ্বল এক জ্যোতিষ্ক। সব ছাড়তে রাজি আছি সত্যকে নয়। সত্যের জন্যে সব বিসর্জন। সেইটাই মানুষের মহতী অর্জন। এই আদর্শই দেহরূপ ধারণ করতে আসছেন তাঁর পিতৃত্বে। সেই জীবনের সারাটা গতিপথে প্রবল তরঙ্গ, সংঘাত, উচ্ছ্বাস। তিনি আসবেন ত্যাগের মুকুট মাথায় দিয়ে কালের সম্রাট। হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর রাজ্যবিস্তার, ভক্তের ভক্তির সিংহাসন। সম্রাট এপারে সম্রাজ্ঞী ওপারে। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমে অদৃশ্য এক ভূখণ্ড, 'মানবধর্মমণ্ডল'।

গয়ায় গিয়ে ক্ষুদিরাম তাঁকে পেলেন। স্বপ্নদর্শন। গদাধর বলছেন — ব্রাহ্মণ আমি তোমার কাছে আসছি। ক্ষুদিরাম শঙ্কিত হয়ে বলছেন প্রভু! দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি। আপনার যথোচিত সেবার সামর্থ যে আমার নেই প্রভু! ভগবান বললেন, তুমি যা করবে, যে-ভাবে করবে তাইতেই আমার সন্তুষ্টি। তোমার চিন্তার কোনো কারণই নেই।

ওপারে শ্যামাসুন্দরী এ-পারে চন্দ্রমণি। সতের বছরের ব্যবধান। কামারপুকুরে গদাধরের অবতরণের সতের বছর পরে সারদা এলেন জয়রামবাটীতে। চন্দ্রমণি আর শ্যামাসুন্দরীর একই অভিজ্ঞতা। চন্দ্রমণির অভিজ্ঞতা আরো বিচিত্র। ক্ষুদিরাম গয়াধামে যখন স্বপ্নদর্শন করছেন। শঙ্কিত হচ্ছেন। প্রভু আসতে চাইছেন সন্তান হয়ে, ঠিক সেইসময় চন্দ্রমণি দেখছেন, এক জ্যোতির্ময় দেবতা বিছানায় তাঁর পাশে এসে শুয়েছেন। প্রথম ভেবেছিলেন তাঁর স্বামী ক্ষুদিরাম। পরক্ষণেই মনে হল, কোনো মানুষের এমন জ্যোতির্ময় রূপ হয় না। তারপরেই মনে হল, দেবতা কি কারণে মানুষের কাছে আসবেন! কখনো কি এসেছেন! ছাঁৎ করে ঘুম ভেঙে গেল। তখনো মনে হচ্ছে তিনি শয্যা অধিকার করে রয়েছেন। ভয় এল। ভীষণ ভয়। নিশুতি রাত। অন্ধকার ঘর। বাইরে নিঝুম গ্রাম। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। প্রদীপ জ্বালালেন। ঘরের দরজা বন্ধ। খিল তোলা। কেউ কোথাও নেই। তা হলে? কে? একটা ভয়। বিস্ময়। স্বামী তীর্থে। কাকে বলা যায়?

পড়শীদের মধ্যে যাঁরা অন্তরঙ্গ, বন্ধুস্থানীয়া, হালদার পুকুরে নাইতে গিয়ে তাঁদেরই বললেন সহজ, সরল চন্দ্রা, কাল রাতে কোনো একপুরুষ এসেছিল আমার ঘরে, আমার বিছানায়। এই গ্রামে আমার ত কোনো শত্রু নেই, তাহলে কে? অতি অন্তরঙ্গ দুজন, ধনী কামারনী ও ধর্মদাস লাহার কন্যা প্রসন্নকে ডেকে পাঠলেন বাড়িতে। রাতের কথা বললেন। তোমাদের কি মনে হয়? সত্যিই কি কোনো লোক কাল রাতে আমার ঘরে এসেছিল? যুগীদের কেউ। মধুযুগীর সঙ্গে কাল বিকেলে একটু বচসা হয়েছিল। সেই কি এসেছিল ভয় দেখাতে!

দুজনে হাসছেন, খুব হাসছেন। তারপরে এক ধমক, মর মাগী, বুড়ি হয়ে পাগল হলি নাকি! স্বপ্ন দেখে যা-তা বলছিস। লোকে শুনলে বলবে কি? তোর নামে বদনাম রটাবে। খবরদার! এ-কথা পাঁচ কান করলে দেখাব মজা। তুই স্বপ্ন দেখেছিস, স্বপ্ন।

এরপরে যা হল, ঠিক ষোল বছর পরে শ্যামাসুন্দরীরও তাই হয়েছিল। একদিন, সন্ধ্যা হয় হয়। সেই রহস্যময় সাঁঝবেলা। সময়ের সন্ধিক্ষণ। যুগীদের শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ধনী আর চন্দ্রা কথা বলছেন, এমন সময় চন্দ্রমণি দেখছেন, শিবলিঙ্গ থেকে একটি দিব্যজ্যোতি ঠিকরে বেরিয়ে এসে মন্দিরের ভেতরে অলৌকিক এক আলোর প্লাবন তৈরি করল। সেখান থেকে

তরঙ্গের আকারে ধেয়ে এল চন্দ্রমণির দিকে। ধনীকে যে-মুহূর্তে বলতে যাচ্ছেন, দ্যাখ, দ্যাখ কি আশ্চর্য, ঠিক তখনই তিনি সেই তরঙ্গে আচ্ছাদিত হলেন। অনুভব করছেন সেই তরঙ্গ প্রবল বেগে তাঁর দেহে প্রবেশ করছে। এমন অভিঘাতে তিনি ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত। শেষে অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন ভূমিতে।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখলেন ধনী শুশ্রূষা করছে। হঠাৎ কি হল তোমাব? চন্দ্রমণি বললেন কি হয়েছিল। বললেন, ওই জ্যোতি আমার উদরে প্রবেশ করেছে। মনে হচ্ছে গর্ভ সঞ্চার হল। ধনী বললে, তুমি একটি নির্বোধ, পাগল। তোমার যা হয়েছে, সেটি বায়ুরোগ। একে বলে বায়ুগুল্ম। খালি পেটে থেকে থেকে আর উপোস করে করে ব্যামোটা ধরিয়েছ। ছেলে তীর্থ থেকে বাড়ি ফিরে এলে কবিরাজ দেখাও। তুমি এসব কথা কারোকে বল না। বলতে নেই। লোকে অপবাদ রটাবে।

ক্ষুদিরাম ফিরে এলেন গয়া থেকে। স্বপ্নদর্শনে বুঁদ হয়ে আছেন। চন্দ্রমণি তাঁর নিজের সমস্ত দর্শনের কথা স্বামীকে বললেন। ক্ষুদিরাম বীর, স্থির মানুষ। স্মিত হেসে বললেন, আরো দর্শন হবে। একটা কিছু ঘটতে চলেছে চন্দ্রা। বোধ হয় আমরা আবার পুত্রমুখ দর্শন করতে চলেছি।

ঠিকই বলেছেন শাস্ত্রজ্ঞ ক্ষুদিরাম। চন্দ্রমণির রূপ যেন ফেটে পড়ছে। সবাই বলতে লাগলেন পঁয়তাল্লিশ বছরে সন্তানসম্ভবা, তায় এত রূপ! কি হবে কে জানে! মারাই না যায়! তাদের আশঙ্কা যাই হোক ক্ষুদিরামের গৃহ সদাসর্বদা পবিত্র গন্ধে ভরপুর। সেই গন্ধের উৎস নানা দেব-দেবী। চন্দ্রমণি দেখছেন, তাঁরা আসছেন, যাচ্ছেন, বসছেন, হাসছেন। চন্দ্রমণির মনে হচ্ছে, তাঁরা যেন সকলেই তাঁর সন্তান। তিনি সকলের মা।

এই অলৌকিক সব অভিজ্ঞতার কথা তিনি স্বামীকে বলেন। জানতে চান, এঁরা কে? অনেক দেব, দেবী আসছেন যাঁদের ছবি তিনি কখনো কোথাও দেখেন নি। অকল্পনীয় রূপ। এই ত একটু আগে একজন এলেন। ওই উঠনে। হাঁসের পিঠে চড়ে। সে মূর্তি আগে কখনো কোথাও দেখিনি। রোদের তাপে মুখখানি রক্তবর্ণ। দেখে বড় মায়া হল। আমি তাঁকে ডেকে বললুম, 'ওরে বাপ হাঁসেচড়া ঠাকুর, রোদে তোর মুখখানি যে শুকিয়ে গেছে; ঘরে আমানি পান্তা আছে দুটো খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যা।' এই কথা শুনে সেই হাঁসে চড়াঠাকুর হাসতে হাসতে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আর দেখতে পেলুম না।

চন্দ্রমণি ভীষণ উৎকণ্ঠায় স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার কি কোন রোগ হল, বায়ুরোগ! না কি গোসাঁইয়ে ধরল?'

গোঁসাই — সুখলাল গোস্বামী — অনিকেত ক্ষুদিরামকে যে মহান পুরুষ কামারপুকুরে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁর হঠাৎ তিরোধানের পর পল্লীতে কিছু ভৌতিক উপদ্রব শুরু হয়। সবাই বলতে লাগলেন, গোঁসাইয়ের প্রেতাত্মা গ্রাম ছেড়ে যাননি। ওই যে, গোঁসাইদের বাড়ির সামনে যে বিশাল বকুল গাছ, সেই গাছটিকে আশ্রয় করেছেন।

ক্ষুদিরাম এতদিনে তাঁর গয়াদর্শনের কথা স্ত্রীকে বললেন। বললেন, তোমার অশেষ সৌভাগ্য, তুমি পুরুষোত্তমকে গর্ভে ধারণ করেছ। সেই কারণেই তোমার এইসব দিব্যদর্শন হচ্ছে। এসো আমরা সেই শুভক্ষণের জন্যে প্রস্তুত হই। শ্রীশ্রী রঘুবীর ছাড়া আমাদের আর কোনো চিন্তা নেই। তাঁর সেবা ছাড়া আর কোনো কর্ম নেই।

জয়রামবাটীর সারদা আর কামারপুকুরের গদাধর। সতের বছর পরে আর সতের বছর আগে। মানুষের পৃথিবীতে দেবতারাও মানুষ। সেই এক দুঃখ-সুখ, হাসি-কান্না। পরিবার বুঝতে পারে না, চিনতে পারে না। ভগবানও সহসা ধরা দিতে চান না। সাধারণ মানুষের পথ ধরেই এগোতে থাকেন। বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ। নরদেবকেও পাঠশালায় যেতে হয়। পণ্ডিতমশাইয়ের তিরস্কার সহ্য করতে হয়। পিতা-মাতার সেবা করতে হয়। বয়স্যদের সঙ্গে খেলা করতে হয়। নরলীলা, শ্রীকৃষ্ণকে হতে হয় রাখালবালক।

গদাধর যখন কামারপুকুরে নামলেন সারদা তখন কোথায়? দূর নভে, বহু আলোকবর্ষ দূরে কোনো ছায়াপথে। এইরকমই ভাবা যায়। পুরুষোত্তম আসছেন গদাধর রূপে। সেই আগমনে অবশ্যই বৈচিত্র্য থাকবে। তখন ফাল্গুন। আকাশে চাঁদ। বুধবার। সকাল থেকেই শ্রীমতী চন্দ্রার অদ্ভুত লাগছিল। মনে বড় আনন্দ; কিন্তু দেহ ক্রমশই অবসন্ন হয়ে আসছে। রঘুবীরের ভোগ রান্না করছিলেন। শরীরের অবস্থা দেখে আশঙ্কা হল যদি প্রসবকাল এখনি উপস্থিত হয় তাহলে দেবসেবার কি হবে। দ্বিতীয় ত কেউ আর নেই। স্বামীকে জানালেন। ক্ষুদিরাম বললেন, কোনো ভয় নেই, তোমার গর্ভে যিনি শুভাগমন করেছেন তিনি রঘুবীরের পূজাসেবায় বিঘ্ন ঘটিয়ে সংসারে প্রবেশ করবেন না — এই আমার ধ্রুববিশ্বাস। তুমি নিশ্চিন্ত হও। আজকের ঠাকুরসেবা তুমি নিশ্চয় চালাতে পারবে। কালকের জন্যে আমি

অন্য ব্যবস্থা করে রেখেছি। ধনীকেও বলে রেখেছি, সে আজ এখানেই শোবে।

চন্দ্রমণি তাঁর স্বামীর কথাকে বেদবাক্য মনে করতেন। তিনি আশ্বস্ত হলেন। উদ্বেগ কেটে গেল। রঘুবীরের মধ্যাহ্ন ভোগ, সন্ধ্যাশীতলাদি নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। রাতের আহারাদিও শেষ হল। সুখলাল গোস্বামী যে গৃহটি ক্ষুদিরামকে দিয়েছিলেন, সেই আস্তানায় রঘুবীরের ঘর ছাড়া আরও দুটি চালা ও একটি পাকশালা ছিল। আর আর একটি ছোট চালার একপাশে ছিল ঢেঁকি, আর অন্যপাশে ধান সেদ্ধ করার উনুন। এই ঢেঁকিশালটিই নির্বাচিত হল। এইখানেই মা তাঁর সন্তানের জন্ম দেবেন। সূতিকাগৃহ। ধনী সেই মতোই সব ব্যবস্থা করলেন।

গ্রামের রাত সন্ধ্যার পরেই নিশুতি। গৃহদেবতা রঘুবীরকে শয়নে দেওয়া হল। চন্দ্রমণি তখনও ঠিক আছেন। রাত বাড়ছে। ক্ষুদিরাম ও জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার আহারাদির পর শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। চন্দ্রাদেবী ও ধনী আর একটি ঘরে শয়ন করলেন।

রাত এগোচ্ছে। শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি। সন্ধ্যার আকাশে দ্বিতীয়ার চাঁদ পশ্চিমের কোলে অদৃশ্য হয়েছে। রাত আর সামান্যই বাকি। এমন সময় অপেক্ষা শেষ হল। ধনী চন্দ্রমণিকে ঢেঁকিশালায় নিয়ে গেলেন। আকাশে ভোরের আলো ফুটব ফুটব করছে, আর ঠিক সেইসময় সেই কাঙ্ক্ষিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হল।

কামারকন্যা, ধাত্রীবিদ্যায় অভিজ্ঞা ধনী তাঁকে গ্রহণ করলেন। রাত্রি শেষের ফিকে আলোয়, অস্পষ্ট অন্ধকারে সেই জাতককে রক্তপিচ্ছিল ভূমিতে রেখে মাতার তাৎক্ষণিক পরিচর্যায় নিযুক্ত হলেন। একপাশে মৃদু প্রদীপের আলো। এইবার নবজাতককে তুলতে গিয়ে দেখলেন, শিশুটি নেই।

এ কি! কোথায় গেল। এই ত এখানে রাখলুম।

ধনী প্রদীপের শিখাটি উজ্জ্বল করলেন। কোথাও নেই। এ কি আশ্চর্য! খুঁজতে খুঁজতে ঘরের এধার থেকে ওধারে গিয়ে দেখলেন, ছোট্ট দুটি পা বেরিয়ে আছে আর শরীরের ঊর্ধ্বাংশ ধান সেদ্ধ করার উনুনের ভেতর অদৃশ্য। সন্তর্পণে শিশুটিকে নিষ্ক্রান্ত করলেন। সর্বাঙ্গে ছাই যেন বিভূতিভূষিতাঙ্গ মহাদেব! ক্ষুদ্র শিব।

সযত্নে পরিচ্ছন্ন করে দীপালোকে তুলে ধরলেন।

ধনী অনেক শিশুকে ধরণীতে এনেছেন, এমনটি কিন্তু পূর্বে দেখেন নি। অতি সুন্দর। কে বলবে সদ্যোজাত। ছ'মাসের ছেলের মতো বড়। হাত দুটি দীর্ঘ। শরীরে দক্ষিণাংশ, কাঁধের দিকে বামদিকের চেয়ে বড়, প্রসারিত। একই শরীরে যেন পুরুষ-প্রকৃতির মিলন। সাধারণের কান দুটি যেখানে থাকে, এই অলৌকিক শিশুর কান দুটি তার চেয়ে নিচুতে। যেন নেমে এসেছে। আকৃতিতে বড়। বেশ বড়। এতটুকু কান্না নেই। নিমীলিত নয়ন। যোগনিদ্রাভিভূত এ কোন নতুন মানুষ!

ভক্ত কবি যখন এঁকে উদ্দেশ্য করে লিখবেন,

এসেছে নতুন মানুষ, দেখবি যদি আয় চলে,
(তাঁর) বিবেক-বৈরাগ্য ঝুলি দুই কাঁধে সদাই ঝুলে।

তখন ধনী কি এই পৃথিবীতে থাকবেন! থাকবেন! তিনিও অমর হবেন। ১৮৩৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি, বুধবারের শেষ রাতে ভবিষ্যৎ তেমন স্পষ্ট নয় বর্তমানের মানুষের কাছে। তবে জন্মক্ষণটি সকলের আলোচনার বিষয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে এই নবজাতকের আগমন।

বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদরা বললেন, উচ্চলগ্নে জাতকের আগমন। ইনি ধর্মবিৎ হবেন। মাননীয় হবেন, সর্বদা পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানে রত থাকবেন। বহু শিষ্যপরিবৃত হয়ে দেবমন্দিরে বাস করবেন। নবীন ধর্মসম্প্রদায় প্রবর্তন করবেন। জগতে এঁর পরিচয় হবে নারায়ণসমভূত এক মহাপুরুষ। লোকপূজ্য এক মহামানব। জন্মলগ্নে রবি, চন্দ্র, বুধ একত্রে। তুঙ্গস্থানে শুক্র, মঙ্গল, শনি। রাত ভোর হতে আর মাত্র অর্ধদণ্ড বাকি সেই সময়ে বালক এলেন শুভ দ্বিতীয়া তিথি, পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র। আবার পরাশর মতে জন্মকালে রাহু, কেতু, তুঙ্গস্থ। বৃহস্পতি তুঙ্গভিলাষি,

ধর্মস্থানাধিপে তুঙ্গে ধর্মস্থে তুঙ্গখেচরে।
গুরুনা দৃষ্টিসংযোগে লগ্নেশে ধর্মসংস্থিতে॥

পৃথিবী মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ, মানুষ তাঁর ভাগ্যবিচার করছেন। ভাগ্য ত একটা আছেই তার নাম সময়। সময়ই নিয়তি।

ধান সেদ্ধ করার উনুন থেকে ছাই মেখে বেরিয়ে মায়ের কোলে। ক্ষুদিরাম দিবালোকে পুত্রকে ভাল করে দেখলেন। গয়ার স্বপ্নদর্শন মিলিয়ে নিতে চাইলেন — কোনরূপে এলে তুমি ভগবান! কয়েকদিন পরেই পিতা এবং মাতা উভয়েই বিস্মৃত হলেন তাঁদের বিচিত্র দর্শনাদির কথা। সম্পর্ক তখন

পিতা, মাতা আর সদ্যোজাত সন্তান। কর্তব্য ও প্রতিপালন এই হল বিষয়। এই দুটির জন্যে প্রয়োজন অর্থের, যার বড়ই অভাব।

মেদিনীপুরে আছেন ক্ষুদিরামের ভাগনে রামচাঁদ। মোক্তারি করেন। অর্থের অভাব নেই। তাঁর কাছে খবর পৌঁছল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল দুধের কথা। মামার সেই অর্থ কোথায়! তিনি প্রথমেই পাঠালেন একটি দুগ্ধবতী গাভী। দুধের সমস্যা মিটল। এরপর যখন যা প্রয়োজন হতে লাগল, সবই আসতে লাগল অনায়াসে।

রাত যখন গভীর হয়, পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন ক্ষুদিরাম একা বসে ভাবেন, জীবনের দিন ত ডানামেলে উড়ে উড়ে যাচ্ছে, যাওয়ার দিন এগিয়ে আসছে। আর কত দিন! সে ভাল, গদাধর নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিচ্ছে। অভাবনীয় উপায়ে। তোমার বাল্যলীলা দেখে যাই। পরবর্তী লীলা সূক্ষ্ম শরীর বলে যদি কিছু থাকে সেই শরীরে দেখব। অনন্তে তোমার পরিচয় পরমপুরুষ, পৃথিবীতে তোমার পরিচয় মৃৎপুত্র। সংসারে — ক্ষুদিরাম তোমার পিতা, মাতা চন্দ্রমণি।

এই বালকটির কোথাও কি কোনও অসাধারণত্ব আছে? আছে বই কি? পল্লীর মায়েরা সবাই যে ছুটে ছুটে আসেন। যখন-তখন আসেন। গৃহে যেন সদা-সর্বদা উৎসব চলেছে। কেন আসেন সবাই ছুটে ছুটে? ওরে থাকতে পারি না যে! কেবলই মনে হয় — যাই একবার দেখে আসি চন্দ্রার ছেলেটাকে। কি সুন্দর হয়েছে! ভীষণ আকর্ষণ! কে বলে তার একটা মা! শত মা! শুধু কামারপুকুর নয়, আশেপাশের গ্রাম থেকেও মায়েরা ঘন ঘন আসেন। আত্মীয়স্বজন যাঁরা আগে কদাচিৎ আসতেন, তাঁরাও আসেন।

বয়স হল পাঁচমাস। এইবার অন্নপ্রাশন। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। ঘটা করা ত সম্ভব নয়। পিতা ক্ষুদিরাম ঠিক করলেন, রঘুবীরের প্রসাদী অন্ন পুত্রের মুখে দেবেন, আর দু-চারজন অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ করবেন।

ক্ষুদিরামের পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। অদৃশ্যের অঙ্গুলি সঞ্চালনে! ধর্মদাস লাহা কি কারণে আছেন কামারপুকুরে। কামারপুকুর গ্রামের বদান্য জমিদার। অদূরেই তাঁর বিশাল বাড়ি। বাড়ির সামনে বিস্তৃত নাট্যমণ্ডপ। লাহাবাবু সেখানে একটি পাঠশালা বসিয়েছেন গ্রামের ছেলেদের শিক্ষার জন্যে। একজন গুরুমশাই নিযুক্ত করেছেন। সকালে একবার আর বিকেলে একবার পাঠশালা বসে। সকাল সাতটা কি আটটায় ছেলেরা পাততাড়ি বগলে আসে।

দু-তিন ঘন্টা লেখাপড়া করে বাড়ি ফিরে যায়। স্নান, আহার। আবার ফিরে আসে তিনটে-চারটের সময়। সন্ধ্যার কিছু আগেই ছুটি। তখন তাদের কলরোলে প্রান্তর মুখরিত। কুলায় ফিরে আসা পাখিদের কলকূজন। ঘরে ঘরে দীপ। শঙ্খধ্বনি। দিনের চোখে নিদ্রা আসে। সব শান্ত। শূন্য নাটমন্দির, গা ঢালা জনহীন প্রান্তর। মন্দিরে মন্দিরে আরতি। গভীর শান্তি।

ফুলের যেমন সুবাস, কামারপুকুরের সুবাস এই দম্পতি — ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রমণি। সেই সুবাসে জমিদার ধর্মদাস লাহাও আমোদিত। ধর্ম আর আদর্শের নাম ক্ষুদিরাম। চন্দ্রমণি আকাশের চন্দ্র। তাঁর স্নিগ্ধ-কিরণে গ্রামবাসী আচ্ছাদিত! চাঁদের শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ আছে। পূর্ণিমা আছে অমাবস্যা আছে, চন্দ্রমণি সদাই পূর্ণিমা।

গয়া থেকে স্বপ্ন নিয়ে এলেন ক্ষুদিরাম। ধারণ করলেন চন্দ্রমণি। নীরব ক্ষুদিরাম স্ত্রীর পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। দেব-ধারিণী মানবী থেকে রূপান্তরিত হয়েছেন দেবীতে। কোথা থেকে তার ভেতরে এসেছে এক সর্বজনীন প্রেম। কুচুটে সংসারের কলকোলাহলের বহু ঊর্ধে চলে গেছে চন্দ্রা। নিজের সংসারের চিন্তা, সে যেমন আছে আছে, প্রবল হয়েছে প্রতিবেশিদের সংসারের চিন্তা। নিজের সংসারের কাজ করতে করতে বারে বারে ছুটে গিয়ে তাদের তত্ত্বাবধান করে আসেন। অভাব দেখলেই লুকিয়ে নিজের সংসার থেকে নিয়ে গিয়ে সেই অভাব পূরণ করে আসেন।

রঘুবীরের সেবার কাজ শেষ করে, স্বামী পুত্রকে আহার করিয়ে নিজ আহারে বসার আগে পল্লীর প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে খবর নিতেন কেউ অভুক্ত আছেন কিনা! তখন বেলা তৃতীয় প্রহর। গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা তখন এইরকমই। প্রতিদিন সকলের আহার জুটবে এমন নিশ্চয়তা নেই। চন্দ্রমণি তা জানেন। এইরকম কখনো কখনো তাঁর নিজেরও হয়। অনুসন্ধানে যদি দেখতেন কারো অন্ন জোটেনি, তাঁকে বাড়িতে এনে সাদরে নিজের অন্ন ধরে দিতেন। কোনো গ্লানি নেই, এমন হলে চন্দ্রার ভীষণ আনন্দ। পরে তিনি সামান্য জলযোগ করে দিনটি কাটিয়ে দিলেন গৃহকাজে দেবসেবায়।

পল্লীর সমস্ত বালক বালিকার তিনি মা, আন্তরিক মা। বড় ছোট সকলেই তাঁর সন্তান। কুলদেবতা রঘুবীর, শীতলাদেবী, রামেশ্বর বাণলিঙ্গটিও তাঁর সন্তান। দেবতা, ভয়, দূরে দূরে সরে থাকা, এসব আগে থাকলেও গর্ভে

গদাধরকে ধারণের পর থেকে সব ভয় ভালবাসায় পরিণত হয়েছে। কোথাও কোনো সঙ্কোচ নেই, হাত জোড় করে কিছু চাইবারও নেই। দেবতারা সব আপনজন।

পাটোয়ারি মানুষের ত অভাব নেই। তাঁরা বলেন, ক্ষুদিরামের স্ত্রীটি অল্পবুদ্ধি পাগল। তা না হলে কেউ নিজের স্বার্থ এমন করে বিসর্জন দেয়! লাহাবাবু বিষয়ী মানুষ, জমিদার, কিন্তু অতি উদার, বিদ্যোৎসাহী, ধার্মিক। তিনি ক্ষুদিরামের পরিবারকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। বিরল গুণের অধিকারী, যেন হরের সঙ্গে গৌরী। তিনি সব খবর রাখতেন। ক্ষুদিরাম তাঁর পরমবন্ধু।

নমোনমো করে গদাধরের অন্নপ্রাশন হবে। কানে এল সংবাদ। তিনি গ্রামের প্রবীণ সজ্জন ব্রাহ্মণদের নিয়ে গুপ্ত পরামর্শে বসলেন। বললেন, আমার কথা বলবেন না, আপনারা গিয়ে ক্ষুদিরামকে চেপে ধরুন, ভাই। ওসব চলবে না। ছেলের অন্নপ্রাশনে আমাদের খাওয়াতে হবে। আমরা কবে থেকে আশা করে আছি।

ক্ষুদিরাম খুব বিপন্ন বোধ করলেন! সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করেন। কাকে বলবেন, আর কাকে বলবেন না। আর যদি সকলকেই বলতে হয়, তাহলে ত বিরাট ব্যাপার। সে সঙ্গতি কোথায়! কি করা উচিত! কে পরামর্শ দিতে পারেন। একজনই আছেন। সময়, অসময়ের বন্ধু ধর্মদাস লাহা। সবার ওপরে আছেন রঘুবীর। যা করেন রঘুবীর। গেলেন ধর্মদাসের কাছে।

ধর্মদাস বললেন, বসো। উতলা হওয়ার কোনো কারণ আছে কি, যখন আমি আছি। তুমি যতটা পার কর বাকিটা আমার। ধর্মদাস হাসছেন, শুভদিন ঠিক কর। গ্রামসুদ্ধ সকলকে আমন্ত্রণ জানাও।

'শুভদিনে ষষ্ঠ মাসে মুখে ভাত পরে / আনন্দের নাহি সীমা ব্রাহ্মণের ঘরে //' লাহাবাবুর ব্যবস্থায় বিশাল আয়োজন। চর্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয়। সবাই নিমন্ত্রিত। কোনো জাতিভেদ নেই। 'গ্রামের ব্রাহ্মণ আর যতেক সজ্জাতি / বৈষ্ণব ভিখারী প্রতিবাসী জোলা তাঁতী //' রঘুবীরের প্রসাদে সবাই পরিতৃপ্ত। লাহাবাবু মাঝে মাঝে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করছেন — কি বুঝছ! ক্ষুদিরামের উদ্ভাসিত মুখ, দু-চোখে জল। বন্ধুকে কি বলবেন! মুখে ভাষা নেই।

কোলে বসে আছেন জীবন্ত বিগ্রহ মনুষ্যরূপী গদাধর মাত্র ছ'বছর বয়স। চন্দনচর্চিত মুখমণ্ডল। পরিধানে জোড়, সে কেমন রূপ! পুঁথির বর্ণনায়—

পরম সুন্দর শিশু রূপের আধার।
শোভে অঙ্গরূপে জিনি মণি অলঙ্কার॥
নব বস্ত্র আভরণ সুশোভিত গায়।
ভালে চন্দনের রেখা হারায় শোভায়॥
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত দৃশ্য বদনমণ্ডলে।
কামারপুকুরবাসী দেখে লোয়ে কোলে॥

ক্ষুদিরাম! সন্তান তোমার দীর্ঘজীবী হোক। মঙ্গল হোক মঙ্গল। দিন যায়। অর্থাভাব! সে কিছুই নয়। সদ্ভাবের অভাবই অভাব। সে ভাবের অভাব ত নেই! ক্ষুদিরামের গৃহ পথের পাশে এক দেবালয় যেন! পুঁথিকারের অপূর্ব বর্ণনায়,

দুটি দুটি খান অন্ন ঘরে রঘুবীর।
নিত্য নিত্য সমাগত অতিথি ফকির॥
প্রশস্ত পথের পাশে ব্রাহ্মণের ঘর।
যে পথে অতিথি নাগা চলে নিরন্তর॥
সে পথে পুরুষোত্তমে যাত্রিগণ চলে।
উঠে ব্রাহ্মণের ঘরে ক্ষুধা তৃষ্ণা পেলে॥

সকালে শীতের রোদ। বড় মধুর। চন্দ্রমণি গদাধরকে কোলে শুইয়ে রোদ খাওয়াচ্ছেন। হঠাৎ দেখছেন গদাধর ক্রমশ ভারি থেকে আরও ভারি, আরও ভারি হয়ে উঠছে। শেষে কোলে আর রাখতে না পেরে সামনে একটা কুলো ছিল, সেই কুলোর ওপর বিছানা সমেত শুইয়ে দিলেন। শিশুর ওজনে কুলো মচমচ, চড়চড় শব্দ করে উঠল। যায় বুঝি মচকে ভেঙে! তখন চন্দ্রমণি তাড়াতাড়ি শিশুকে কোলে তুলে নিতে গেলেন। গদাধর গভীর নিদ্রায়। পর্বতের চেয়েও ভারি। এক চুলও নড়াতে পারলেন না। চন্দ্রমণি আতঙ্কে কেঁদে উঠলেন — এ কি হল আমার ছেলের।

প্রতিবেশী মায়েরা ছুটে এলেন, কি হল চন্দ্রার! কি হয়েছে? রোদে নিয়ে বসেছিলুম। দেখি কি ক্রমশ ভারি হয়ে উঠছে। কোলে রাখতে না পেরে কোনওরকমে এই কুলোয় শোয়ালুম। এখন আর তুলতে পারছি না। তিন মণ পাথরের মতো ভারি।

কি বলছিস কি? কই দেখি!

সকলেই চেষ্টা করলেন পালা করে। অসম্ভব! পাহাড়ের মতো ভারি। অনেকেই এসে গেলেন। ওই যে বিশাল নিমগাছ!

সবাই তাকালেন। শীতের বাতাসে পাতা নাচছে। সকলেরই বিশ্বাস — ওই গাছে একজন ব্রহ্মদৈত্য থাকতেন। আবার ফিরে এসেছেন। এ তাঁরই কাজ। শিশুটিকে ভর করেছেন। ডাকো ওঝা!

ওঝা এলেন। অনুনয়, বিনয়। তারপর কাঁদুনি সুরে মন্ত্র পাঠ। কোন মন্ত্র? হয় ত এইটি,

ওঁ নমো ভগবতে ভূতেশ্বরায়,
কিল, কিল তর বায়,
রুদ্র দংষ্ট্রাকরালয়ে বক্ত্রায়,
ত্রিনয়ন ভীষণায়
ধগধগিত পিশাঙ্গ ললাট নেত্রাম্,
জয় জয় ভূত ডামরয় আত্মরূপং
দর্শে দর্শে নিরতে নিরতে সর সর চল চল,
পাশেন বন্ধ বন্ধ হুঙ্কারেন ত্রাসয় ত্রাসয়
বজ্রদণ্ডেন হন হন নিশিতি খঙ্গেন
ছিন্ন ছিন্ন শূলাগ্রে ভিন্ন ভিন্ন,
মুদ্গারেণ চূর্ণয় চূর্ণয় সর্ব গ্রহাণাং
আবেশয় আবেশয়।

কি হল, কে বলবে. ছেলের ওজন কমে গেল ভূতেশ্বর মহাদেবের নামে। চন্দ্রমণি কুলো থেকে কোলে তুলে নিলেন। সেই ঐতিহাসিক কুলোটি আজ আর নেই। দেখতে দেখতে গদাধরের বয়েস হল সাত-আট মাস। চন্দ্রাদেবী স্তন্যদান করছিলেন। শিশু ঘুমিয়ে পড়ল। বিছানায় শুইয়ে দিলেন। মশারি ফেলে দিলেন। দিনের বেলাতেও ভীষণ মশা।

সংসারে অনেক কাজ। চন্দ্রাদেবী গৃহকাজে ব্যস্ত হলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে কি একটা প্রয়োজনে ঘরে এসে চমকে উঠলেন। মশারির মধ্যে কে শুয়ে! শিশু কোথায়! দীর্ঘকায় অপরিচিত এক পুরুষ মশারি জুড়ে শুয়ে আছেন।

চন্দ্রাদেবী আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে ঘরের বাইরে এলেন, তুমি কোথায়? শিগ্‌গির এসো। ক্ষুদিরাম ছুটে এলেন। কি হয়েছে? গদাধর নেই। মশারি ফেলে শুইয়ে গিয়েছিলুম। এখন দেখছি, কে এক বিশাল পুরুষ শুয়ে আছেন।

দুজনে ঘরে ঢুকলেন।

কোথায় কি? বালক যেমন ঘুমোচ্ছিল সেইরকমই ঘুমোচ্ছে। যে-দর্শন মাতা চন্দ্রমণির অহরহ হচ্ছে, সেই দর্শন ক্ষুদিরামের হল না। গয়ার স্বপ্নদর্শন বাস্তব হয়েছে — এই পর্যন্ত, কিন্তু চন্দ্রমণির দর্শনের শেষ নেই। অনেক ভাগ্যবান, ভাগ্যবতীর এমন হয়।

ক্যাথারিন অব সিয়েনা ছ বছর বয়সে এক গির্জার উপরের অলিন্দে খৃষ্টের মূর্তি দেখতেন। এই স্বপ্নঘোরেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। কতবার যে দেখেছিলেন তার কোনো হিসেব নেই। প্রতিবার দর্শনের পরেই তিনি সংজ্ঞা হারাতেন।

আর এক সাধিকা সেন্ট টেরেসা। তিনি এতবার খৃষ্টমূর্তি দেখেছেন যে একসময় তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি আর খৃষ্ট এক। বৃন্দাবনের গোপীরা অনুক্ষণ কৃষ্ণকে স্মরণ করে একসময় নিজেদেরই কৃষ্ণ ভাবতে লাগলেন। জেলালুদ্দিন, হাফিজ, জামি, এঁদেরও বহু রকমের দর্শন হত। মহাপ্রভুর ভাবে ভাবিত শ্যামানন্দ। একদিন বৃন্দাবনে এক মন্দিরে গিয়ে দেখলেন, আরতি হয়ে গেছে, পূজারীরা চলে গেছেন! একা একপাশে বসে আছেন। হঠাৎ দেখছেন কি — রাধিকা এসেছেন চুপিচুপি। শ্রীকৃষ্ণের চারপাশে ঘুরছেন আর নৃত্য করছেন। সে কি স্বর্গীয় ভঙ্গী! শ্যামানন্দ অপলক দৃষ্টিতে দেখছেন। কখন রাত ভোর হয়ে গেল। মন্দিরের বাইরে পাখিদের কলকাকলী। রাধিকা চমকে উঠে দ্রুত মন্দির ছেড়ে যে-অদৃশ্য লোক থেকে এসেছিলেন সেই লোকে চলে গেলেন। পড়ে রইল তাঁর একটি পায়ের স্বর্ণ নূপুর।

স্বপ্ন বলে এই দর্শনটিকে উড়িয়ে দেওয়া যেত; কিন্তু ওই স্বর্ণ নূপুরটি ত এক প্রত্যক্ষ নিদর্শন। সেটি ত মিথ্যা নয়। শ্যামানন্দ সেই নূপুরটি হাতে নিয়ে তাঁর গুরু জীব গোস্বামীর কাছে গেলেন। শ্যামানন্দ কাঁদছেন আর তাঁর দর্শনের কথা গুরুকে নিবেদন করছেন। খবরটি রাষ্ট্র হয়ে গেল সমগ্র বৃন্দাবনে। কেউ অবিশ্বাস করলেন না। সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। কোনও কোনও ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।

চন্দ্রমণি সেইরকম এক ভাগ্যবান। কিন্তু আবার সেই ভয়, আমি দেখেছি, স্পষ্ট দেখেছি, মশারির ভেতর আমার ছোট্ট গদাধর নয় বিরাটকায় এক পুরুষ। কোনো ভুল নেই। অপদেবতা ভর করেছে। তুমি গুনীন ডাকাও।

ক্ষুদিরাম বললেন, শান্ত হও। তুমি জান, এই পুত্র আসার আগে আমাদের অনেক দিব্যদর্শন হয়েছে, এখনও হচ্ছে, পরেও হবে। ভয় পেও না। আর জেনে রাখ, বাড়িতে স্বয়ং রঘুবীর রয়েছেন, আমরা তাঁর আশ্রিত। এ গৃহে কোনও অপদেবতার প্রবেশের ক্ষমতা হবে না। একটা কথা, তুমি এইসব দর্শনের কথা আমাকে ছাড়া আর কারোকে বলবে না। রঘুবীর আমাদের সন্তানকে সদাসর্বদা রক্ষা করছেন। কোনও ভয় নেই।

দিন যায়, মাস যায়। গদাধরের বয়স বাড়ছে। শিক্ষার সময় এল। ক্ষুদিরাম কোলে বসিয়ে মুখে মুখে শেখাতে লাগলেন, পূর্বপুরুষদের নাম। দেবদেবীর ছোট ছোট স্তোত্র। প্রণাম মন্ত্র। রামায়ণ, মহাভারতের গল্প।

অসাধারণ মেধা। একবার শোনামাত্রই সব মুখস্থ। পরীক্ষা করার জন্যে অনেকদিন পরে পরে জিজ্ঞেস করে দেখেছেন, সব মনে আছে। তবে এও লক্ষ্য করলেন, যে বিষয়ে আগ্রহ নেই সে বিষয় শত চেষ্টাতেও শেখান যায় না, যেমন গণিত, নামতা। ক্ষুদিরাম মনে করলেন, ঠিক আছে, বয়স আর একটু বাড়লে নিজে থেকেই শিখবে।

গদাধর শান্তশিষ্ট নয়, বড়ই চঞ্চল। এই চঞ্চলতা দূর করার জন্যে পিতা ক্ষুদিরাম যথাশাস্ত্র লেখাপড়া শুরু করিয়ে দিলেন। ভর্তি করে দিলেন লাহাবাবুদের পাঠশালায়। সেখানে অনেক সমবয়সী বন্ধু হল। মিশুক ছেলে গদাধর। সকলেই তাকে ভালবাসে। গদাধর শিক্ষকেরও প্রিয়। শিক্ষা ভালই এগোচ্ছে। একটি মাত্র সমস্যা গণিত। অঙ্কে মন নেই। মাথায় ঢোকে না।

সামনেই লাহাবাবুদের বাড়ি। গদাধর সুযোগ পেলেই সেরেস্তায় চলে যান। ধর্মদাসবাবুর হিসেব-নিকেশ মাথায় উঠত। গদাধরকে দেখলে বিষয় চিন্তা মাথায় উঠত। খানিক গল্পের পর অন্দর মহলে পাঠিয়ে দিতেন, 'যাও বাপ খাও গিয়া কি রেখেছে ঘরে।'

ধর্মদাসের স্ত্রী গদাধরকে নিজের ছেলের মতো ভালবাসেন। ধনী মানুষ। বাড়িতে বিশাল গোশালা। প্রচুর দুধ। ক্ষীর, সর, ননীর অভাব নেই। বালক গদাধরকে প্রাণভরে খাওয়াতেন। বসে বসে দেখতেন সুন্দর শিশুটির সেবা। যেন শ্রীকৃষ্ণ মাতা যশোদা।

গদাধরের আগমন মানে উৎসব। পবিত্র বাতাসের মতো। গৃহের চেহারা অন্যরকম হয়ে যাওয়া। বিষয় কিছুক্ষণের জন্যে পালিয়ে যেত। কত গান। কত পুরাণের কথা। শিশুকণ্ঠে অভিনয়। উজ্জ্বল মুখমণ্ডল। প্রশস্ত বুক। দীর্ঘ বাহু। সব কাজ ফেলে পরিবারের সবাই ছুটে আসতেন।

ধর্মদাসের বড় ছেলে গয়াবিষ্ণু গদাধরের সমবয়সী। দুজনের ভীষণ বন্ধুত্ব। একসঙ্গে খাওয়া, শোওয়া, বেড়ান, গান, গল্প। লাহাপরিবার দুজনকে এমন অভিন্ন হৃদয় দেখে 'স্যাঙাৎ' পাতিয়ে দিলেন। মেয়েরা যেমন 'বকুল ফুল' পাতায়।

শৈশব যেন স্বপ্ন। বিশাল প্রান্তর। আম্রকানন। শান্ত শ্রীপল্লী। একপাশে ভূতির খাল কুলুকুলু বহে যায় আমোদরের দিকে। এত সবুজ কে ঢেলে দিল। এই খালের পাশেই শ্মশান — ভূতির শ্মশান। বিশাল একটি বটবৃক্ষ। অতি প্রাচীন। এরই ছায়ায় অগ্নিরথে আরোহণ করে মানুষ এই লোক থেকে অন্যলোকে চলে যায়। আর ফেরে না কোনও দিন। এই শ্মশানে গদাধরকে একদিন আসতে হবে। এখানেই সেই গোচারণের মাঠ। যেখানে বালক গদাধর একদিন অনন্তের স্পন্দনে সংজ্ঞা হারাবেন।

কামারপুকুরের পূর্বপ্রান্তে বুধুই মোড়লের শ্মশান। একটি ছোট পুষ্করিণী। শ্মশান কিন্তু মনোরম। চারিদিকে বট আরও অনেক গাছ। এই শ্মশানও একদিন গদাধরের সাধনভূমি হবে। কাল আর একটু অতীতে চলুক। সব সাজান আছে। জয়রামবাটী আপাতত স্তব্ধ। এখনো সেখানে ইতিহাস অঙ্কুরিত হয়নি। একটি অখ্যাত গ্রাম মাত্র। গদাধরের জন্যে এখনো সেখানে একটি ফুল ফোটেনি।

কলকাতার দিক থেকেই ত সব আসবে। সেখানেও এখনও আসর সেজে ওঠেনি। কামারপুকুর কলকাতা থেকে তখনও অনেক দূরে। গদাধরের কলকাতা বিজয় তখনো শুরু হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। কলকাতা তখন জমজমাট। একদিকে বড়লোকদের টাকা উড়ছে আমোদে প্রমোদে, বিলাস ব্যসনে। ক্ষমতাশালী ইংরেজদের তোষণে কিছু বাঙালী অতি উৎসাহী। ইংরেজরা তখন দেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিকেও গ্রাস করতে চাইছেন। এর ভাল এবং মন্দ দিক, দুটিই আছে। আবার সংস্কৃত ভাষার চর্চা ও শিক্ষা দুটিই চলছে। গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনে পণ্ডিতমশাইদের পাঠশালার পাশাপাশি তাঁরই উৎসাহে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে 'হার্ডিঞ্জ

মডেল স্কুল' স্থাপিত হচ্ছে। বাঙলা এবং ইংরিজি উভয় ধরনের বিদ্যালয়। স্থাপিত হয়েছে 'স্কুল বুক সোসাইটি'। কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, বিশপস কলেজ।

প্রথমে বাণিজ্যে এলেন ইংরেজরা। তখন সমুদ্র খুলে গেছে। ভাগ্যান্বেষী, সাহসীরা সমুদ্রে ভেসেছে অজানা, অজ্ঞাত স্থলদেশের সন্ধানে। বাণিজ্য, সাহস, অ্যাডভেনচারের মিলন ঘটেছে। ভারতের ভাগ্যপ্রবাহ এইরকম — আকবর, জাহাঙ্গীর, সাহজাহান, আওরঙ্গজেব, বাহাদুর শাহ, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি।

১৬০০ সালের ডিসেম্বরে লন্ডনে এই কোম্পানি স্থাপিত হল। রানী এলিজাবেথ অনুমোদন দিলেন। এই প্রতিষ্ঠান ভারত, এশিয়া ও আফ্রিকার সঙ্গে বাণিজ্য করার অনুমতি পেলেন।

ভারতে আকবরের শাসনকাল শেষ হতে চলেছে। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করবেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনী লিখবেন —

'আল্লার অসীম অনুগ্রহে হিজরি ১০১৪ সনে, জামাদা-স্-সানি মাসের ২০শে তারিখ, বৃহস্পতিবার (১৬০৫, ২৪ অক্টোবর) আমার আটত্রিশ বছর বয়সে রাজধানী আগ্রায় সিংহাসনে উপবেশন করি।

আমার পিতার আঠাশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর কোনও সন্তানই জীবিত ছিল না। তিনি দরবেশ ও সাধুসন্ন্যাসীদের কাছে অনবরত এই প্রার্থনাই জানাচ্ছিলেন যে তাঁরা যেন আল্লার দরবারে এই আরজি পেশ করেন যাতে তাঁর একটি পুত্র রক্ষা পায়। খাজা মুইনুদ্দিন চিস্তি ভারবর্ষের সাধু ফকিরদের শিরোমণি ছিলেন। আমার পিতা মনে করেছিলেন যে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য তিনি তাঁর পবিত্র আস্তানায় নিজে হাজির হবেন। তিনি শপথ করেছিলেন যে যদি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁকে একটি পুত্রসন্তান দান করেন তাহলে তিনি দীনহীনের মত আগ্রা থেকে পদব্রজে ১৪০ ক্রোশ দূর মহামান্য চিস্তির পবিত্র সমাধিস্থলে গমন করবেন।

হিজরি ৯৭৭ সনে রবিউল আওয়ান মাসের ১৭ তারিখ (২১ আগস্ট ১৫৬৯) বুধবার, দিনের সাতঘড়ি পার হওয়ার পর যখন তুলারাশি ২৪ ডিগ্রিতে, সেই সময় সর্বশক্তিমান আল্লা তাঁর গুপ্ত শূন্যস্থান থেকে এই পৃথিবীতে আমাকে পয়দা করলেন।'

আকবর একটি পুত্রসন্তানের যখন ভীষণ ব্যাকুল সেই সময় আগ্রা জেলার সিক্রি গ্রামের এক পাহাড়ে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন এক দরবেশের কুঠিয়া ছিল। সাধকের নাম, সেখ সেলিম। সদাসর্বদা ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন। দিব্যঅবস্থা প্রাপ্ত। সম্রাট আকবর আধ্যাত্মিক পুরুষদের খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতেন। তিনি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। বিষণ্ণ আকবর। ভারাক্রান্ত মন। মহাপুরুষকে মনের ক্ষেদ নিবেদন করে প্রশ্ন করলেন — আমার কটি পুত্রসন্তান হবে? ধ্যানস্থ মহাপুরুষ সম্রাটকে বললেন, সেই মহান দাতা যিনি মুখ ফুটে না বললেও মনের ইচ্ছা পূরণ করেন তিনি তোমাকে তিনটি পুত্র দান করবেন।

আকবর আশ্বস্ত হয়ে দরবেশকে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন — আমি শপথ করছি যে আপনার অনুগ্রহে আমার প্রথম পুত্র জন্মালে তাকে আমি আপনার নামে সঁপে দেব যাতে আপনার আশীর্বাদ ও দয়া তার রক্ষক হয়। দরবেশ সম্রাটের কথায় সম্মতি জানিয়ে বললেন, আমি তোমাকে তোমার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের জন্যে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আরও বলি, তোমার পুত্র জন্মালে আমি আমার নিজের নাম তাকে দেব।

জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন — 'মায়ের প্রসবকাল উপস্থিত হলে পিতা তাঁকে সেখের আবাসে পাঠিয়ে দেন এবং সেখানেই আমার জন্ম হয়। আমার জন্মের পর আমার নাম দেওয়া হয় সুলতান সেলিম। কিন্তু আমার বাবাকে তাঁর সুরাপানের অবস্থাতেই হোক অথবা তাঁর স্বাভাবিক শান্ত অবস্থাতেই হোক কখনই আমাকে মহম্মদ সেলিম অথবা সুলতান সেলিম বলে ডাকতে শুনিনি। সব সময়ই ডাকতেন সেখবাবা বলে। আমার মহামান্য পিতা আমার জন্মস্থান সিক্রিকে তাঁর ভাগ্যের দ্যোতক মনে করে সেখানেই তাঁর রাজধানী স্থাপন করলেন। চোদ্দ-পনেরো বছরের মধ্যে হিংস্র জন্তুপূর্ণ সেই পাহাড়ী জায়গাটি নানা সুশোভিত উদ্যান, অট্টালিকা, উচ্চ জমকালো প্রাসাদ এবং নানা মনোহর স্থানে পূর্ণ হয়ে উঠল। গুজরাট জয়ের পর এই স্থানের নাম হল ফতেপুর।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হল ১৬০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর। ১৬০৩ সালে কোম্পানির এক প্রতিনিধি, জন মিলাডেনহল আগ্রায় এলেন। রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে সম্রাট আকবরের সঙ্গে দেখা করে ভারতে বাণিজ্যের সুবিধা চাইলেন। ফল হল না। ১৬০৮ অবধি অপেক্ষা করতে

হল। তখন জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কাল। জাহাঙ্গীরকে চালাতেন তাঁর স্ত্রী সুন্দরী নুরজাহান।

এই সপ্তদশ শতক বঙ্গবাসীর পক্ষে কেমন ছিল? ইতিহাসের কোন কালে বাঙালির বরাত ভাল ছিল? বড় অসহায় বাঙালি। ইংরেজ আসার ঢের আগে ভাস্কো ডা গামা কেপ অফ গুড হোপ ঘুরে মালাবারে ভিড়লেন। হারমাদ জলদস্যুর দল। ১৪৯৮ সাল।

বাঙলার পূর্ব দক্ষিণ সীমান্তে শুরু হল এদের উৎপাত। এদের সঙ্গে যোগ দিল মগদস্যুরা। মোগল সম্রাটের প্রবল শত্রু হয়ে দাঁড়াল এই দস্যুদল। গায়ে লাল কুর্তা, মাথায় নানা রঙের পাগড়ি। হাতে দূরবীন। শ্যেনপক্ষীর মতো সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে দূরবীনে চোখ রেখে। সমুদ্রগামী জাহাজ যেই চোখে পড়ল অমনি ছোট ছোট ক্ষিপ্রগতি ডিঙ্গিতে চড়ে বণিকদের জাহাজটিকে ঘিরে ধরে লুটপাট চালাত।

চট্টগ্রামের উপকূলের বাণিজ্য তরীগুলি এদের উৎপাতে একা যেতে সাহস পেত না। একসঙ্গে অনেক জাহাজের একটি বহর তৈরি হত। এদের সঙ্গে যুদ্ধের নানা বিষাক্ত অস্ত্র থাকত। আর থাকতেন একজন রণপণ্ডিত। তাঁকে বলা হত 'বহরদার'। তিনিই জাহাজের গতিপথ ঠিক করে দিতেন। নোঙ্গর ফেলার স্থান নির্বাচন করে দিতেন। কবিকঙ্কণ লিখলেন, শ্রীমন্ত সদাগরের নাবিকেরা 'রাত্রিদিন বাহি যায় হার্মাদের ডরে।'

সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষদের যথেষ্ট সাহস ছিল। সুযোগ পেলেই তারা হার্মাদদের দেশীয় উপায়ে জব্দ করে দিত। একটি পল্লীগীতিতে উল্লেখ আছে জেলেরা তাদের বৃদ্ধ দলপতির পরামর্শে একজোট হয়ে পেছনদিক থেকে হঠাৎ এসে হার্মাদদের প্রত্যেকের চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছুঁড়ে দিয়ে তাদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করছে।

শুধু সমুদ্রে নয় গ্রামে গ্রামেও এদের হামলা শুরু হয়েছিল। নিরীহ পল্লীবাসী এদের শিকার। সুন্দরী গৃহবধূদের নিস্তার ছিল না। একটি পল্লীগাথায় আছে — বধূটি নদীতে স্নান করছিল এমন সময় হার্মাদরা তাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। বধূটি স্বামীকে স্মরণ করে বিলাপ করছে — অভাগিনীকে মনে রেখ। ঘাটে আমার কলসী পড়ে রইল, আমার হাতের কঙ্কণ ফেলে এসেছি; আমাকে মনে করে দুঃখ হলে কঙ্কণ আর কলসী তোমার হাত দুখানি দিয়ে ছুঁয়ো — তাতে আমি জুড়াব। আর সুন্দরী দেখে একটি

মেয়ে বিয়ে কোরো। আমি যে আদর ও স্নেহের জন্যে পাগল ছিলাম, তা তাকে দিও, হতভাগিনীর অদৃষ্টে তা নেই।

কোনো বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে, কি অন্য কোনও উৎসব, হঠাৎ শুরু হল হার্মাদদের হামলা। অকথ্য অত্যাচার। এদের ভয়ে সমুদ্রের ধারের গ্রাম, দ্বীপ সব জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে সকলকে বন্দী করে তাদের হাতের তালু ফুটো করে সরু বেত চালিয়ে দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যেত তাদের জাহাজে, যেন শত শত পশু। ঢুকিয়ে দিতো জাহাজের পাটাতনের নিচে 'হোল্ডে'। সেই সঙ্গে চলত বেদম প্রহার। মানুষের আর্ত চিৎকারেই তাদের আনন্দ। খাঁচার পাখির সামনে যে ভাবে শস্য ছড়িয়ে দেয় ঠিক সেই ভাবে ওই বন্দীদের সামনে কয়েক মুঠো চাল ছড়িয়ে দিত। এই হল খাদ্য। অনেকেরই মৃত্যু হত। যাঁরা বেঁচে থাকতেন তাঁদের দাস, দাসী হিসেবে বিক্রি করে দিত দাক্ষিণাত্যের ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের কাছে।

অনেক সময় তাদের তমলুক ও বালেশ্বর বন্দরেও বিক্রি করা হত। মোগল শাসককুল এই দস্যুদের সঙ্গে পেরে উঠতেন না। মোগল সাম্রাজ্য বিশাল বিস্তৃতির কারণে অধিকাংশ অঞ্চলেই অরক্ষিত ছিল। কোনও কোনও বছরে হার্মাদরা এই রাজ্যের এগার হাজারের মতো স্ত্রী-পুরুষকে বন্দী করে এনে বিক্রি করেছে। এদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল, বাকলা, শালিমাবাদ, যশোর, হুগলী, হিজলি, উড়িষ্যা। এমন একটা সময় এল, দেখা গেল পাঁচ বছরে ১৮,০০০ স্ত্রী-পুরুষকে ধরে নিয়ে গেছে হার্মাদরা।

এদের দোসর হল আরাকানের মগরা। দেশটা যেন 'মগের মুল্লুক'! চরম অরাজকতা প্রায় সর্বত্র। জাহাঙ্গীর ত আকবর নন। আগ্রার দেওয়ানি-খাসের প্রবেশদ্বারের শীর্ষে যতই লিখুন না কেন 'স্বর্গ যদি থাকে, তাহা এইখানে — এইখানে।' প্রজাসাধারণকে যতই মনে করান হোক 'দিল্লীশ্বরো বা জগদ্বীশ্বরো বা', মোগল সূর্য পশ্চিমে ঢলছে। ভারতবর্ষের নিয়তি তৈরি হচ্ছে।

পিতা আকবর সব ব্যাপারেই অনন্য। ভালর কাছে যেমন ভাল, খারাপের কাছে ততোধিক খারাপ। কেউ পরাক্রম দেখালে তবেই তিনি তাঁর পরাক্রম দেখাতেন। ভারতের আসমুদ্র হিমাচল তিনি তাঁর সুযোগ্য শাসনে জড়িয়ে ধরেছিলেন। ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদার। হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ ছিল

না। খৃষ্টানদের ব্যাপারেও উদার। হিন্দুদের প্রতি তাঁর অনুরাগ শুধু মুখের অনুরাগ ছিল না, আন্তরিক ও যথার্থ ছিল।

রাজা বীরবল ছিলেন সামান্য এক কবি। ভাট। আকবর তাঁকে রাজা করে দিলেন। শুধু তাই নয় বীরবল হলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। বীরবলের মৃত্যু সংবাদ শুনে সম্রাট তিনদিন মৌনী ছিলেন। বড় ছেলের বিবাহ দিলেন মানসিংহের বোনের সঙ্গে। মানসিংহকে করলেন তাঁর সাম্রাজ্যের প্রধান কাণ্ডারী। সাতহাজার সৈন্যের মনসবদার। কোনও মুসলমান আমীরও এত বড় পদ পাননি। আকবর হিন্দুধর্মের অনুরাগী হয়ে একটি নতুন ধর্ম প্রচার করলেন, যার নাম রাখলেন 'এলাহী ধর্ম'। তিনি নিজে তিলকধারণ করতেন। মাঝে মাঝে নিরামিষ খেতেন। ব্রাহ্মণদের দিয়ে হাতে রাখি বাঁধাতেন। হোম করতেন। খৃষ্টান পাদ্রিদের মনেও বিশ্বাস জাগাতে পেরেছিলেন, যে তিনি তাঁদের ধর্ম মানেন।

ফতেপুর থেকে বাঙলা অনেক দূর। আর সময় তার ত আদি-অন্ত নেই এদিকে ওদিকে। ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ এই দুশোবছর বঙ্গদেশের সুসময়। কারণ এই দুশোবছর নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা ভোগের কাল। বাংলায় তখন সুলতানদের শাসনকাল। দক্ষ শাসন। বাঙলা তখন তিনটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল — লখনৌতি বা লক্ষ্মণাবতী, সোনারগাঁও এবং সাতগাঁও। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বের শেষ পাদ থেকে দুর্ভাগ্যের সূচনা।

'হোসেন শাহের আমল' মানে বাঙালিজীবনের অতি উজ্জ্বল এক সময়। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে বাঙালি উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। এইকালেই যে মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছিল। হোসেন শাহের রাজত্বকালেই চৈতন্যদেব নবদ্বীপে লীলা করেছিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। মহাপ্রভুর প্রভাবে ধন্য হয়েছিল 'হোসেন শাহের আমল'।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাব না হলে বিম্বিসারকে কে চিনত। কে মনে রাখত কলিঙ্গরাজ অশোককে। মহাপ্রভুর জীবনীকাররাই হোসেন শাহর রাজত্বকাল সম্পর্কে সবিস্তারে লিখেছেন। 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যচরিতামৃত', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের আগেই হোসেন শাহ তাঁর সম্বন্ধে আগ্রহী হয়েছিলেন। এরপর চৈতন্যদেব গৌড়ের অনতিদূরে রামকেলিতে এসেছেন

সপার্ষদ, যাবেন বৃন্দাবনে। সংকীর্তনানন্দে বিভোর। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতের শেষখণ্ডে লিখেছেন, বিভোর হরিনামে মহাপ্রভু,

নিকটে যবন রাজা পরম দুর্বার।
তথাপিহ চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার॥
নির্ভয় হইয়া সর্বলোক বোলে হরি।
দুঃখ শোক গৃহবিত্ত সকল পাসরি॥
কোটোয়াল গিয়া কহিলেক রাজস্থানে।
এক ন্যাসী আসিয়াছে রামকেলী গ্রামে॥
নিরবধি করয়ে ভূতের সংকীর্তন।
না জানি তাঁহার স্থানে মিলে কতজন॥
রাজা বোলে কহকহ সন্ন্যাসী কেমন।
কি খায়, কি নাম, কৈছে দেহের গঠন॥

'কোটোয়াল' উচ্ছ্বসিত। সন্ন্যাসীর রূপ, গুণ, আচরণ বর্ণনা করলেন। রাজা তখন কেশবখানকে ডাকলেন। সন্ন্যাসীর কথা তুমি বল, মুনি। বহু মানুষ কেন তাঁকে দেখার জন্যে ছুটছে।

কবি কর্ণপূর বৃন্দাবন দাসের সমসাময়িক। 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে এই ঘটনার কথা লিখছেন। গৌড়েশ্বরের রাজধানী থেকে গঙ্গার দিকে চলেছেন মহাপ্রভু। অসংখ্য মানুষ তাঁর সঙ্গে, দুপাশে এবং পেছনে। গৌড়েশ্বর আমাদের চিলেকোঠায় বসে এই দৃশ্য দেখে কেশব বসু নামে তাঁর অমাত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে এ কী। এত লোক কেন?' অমাত্য বললেন, 'সুলতান! শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামে একজন মহাপুরুষ পুরুষোত্তম থেকে মথুরায় যাচ্ছেন। সেই কারণে তাঁকে দেখতে এত লোক আসছে।' এ কথা শুনে গৌড়েশ্বর বললেন, 'ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর! নয়তো এত লোক আকৃষ্ট হবে কেন'।

হোসেন শাহের আমলে রামকেলিতে বহু ব্রাহ্মণের বসবাস ছিল। তাঁদের সমাজ ছিল। রামকেলিতে বসেই করঞ্জগ্রামীণ ব্রাহ্মণ চতুর্ভুজ ১৪৯৪ সালে 'হরিচরিত' কাব্য রচনা করেছিলেন। এইখানেই কানাই-নাটশালা গ্রামে মহাপ্রভু 'কৃষ্ণ চরিত্রলীলা' দর্শন করেছিলেন। এই রামকেলিতেই হোসেন শাহর মন্ত্রী সনাতন ও তাঁর ভাই রূপ মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করেন। কিছুদিন পরেই চাকরি ও সংসার ছেড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন।

হোসেন শাহের দরবারে সনাতন এলেন কি ভাবে! কোনো কোনো ভাগ্যবানের জীবন নিয়তি চালিত। হোসেন শাহের অভ্যুত্থানের আগে বাঙলায় চলছিল হাব্‌শী রাজত্ব। হাবশী রাজারা মাত্র ছ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তিন বছর রাজত্ব করেন সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহ। রাজা হিসেবে ইতিহাসে এর যথেষ্ট সুনাম। বাঙলাদেশের শ্রেষ্ঠ সুলতানদের ইনি অন্যতম। একবছর রাজত্ব করেন কুৎবুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ। আর বাকি দুবছর সুলতান শাহজাদা ও শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ। প্রথমে রাজা হয়েছিলেন সুলতান শাহজাদা, শেষে রাজা হয়েছিলেন শামসুদ্দীন। এই দুজন ইতিহাসে অতি কুখ্যাত। হাবশী কথার অর্থ কী? ক্রীতদাস এবং নপুংসক। রাজারা হারেম রক্ষার কাজে এঁদের নিয়োগ করতেন। রাজার আস্থাভাজন কেউ কেউ দল তৈরি করে ঘোঁট পাকিয়ে, বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে, রাজাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করতেন। এঁদের বলা হত মহাবীর। বীরত্বের জন্যে সম্মানিত। রাজকক্ষে পাহারাদার। এঁদের দলের প্রধানরা অবশ্যই নপুংসক। এঁদের কালে বাংলাদেশে একটা প্রথাই চালু হয়ে গেল যে-ই রাজাকে হত্যা করবে সেই সিংহাসনে আরোহণ করবে।

বাবর তাঁর আত্মকথায় লিখছেন, 'বাঙলা রাজ্যে একটি বিস্ময়কর প্রথা হল, উত্তরাধিকার প্রথা অনুসারে সেখানে কেউ সিংহাসন লাভ করার সুযোগ পায় না। অতি বিরল ঘটনা। যে কোন লোক যদি রাজাকে হত্যা করে নিজে সিংহাসনে বসে, তাহলে সে-ই রাজা হয়। আমীর, উজীর, সৈন্য, কৃষকেরা সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে মাথা নত করে বশ্যতা স্বীকার করে। সে-ই তখন আইনসঙ্গত রাজা। বাঙালীরা বলে — আমরা সিংহাসনের প্রতি অনুগত, যে কেউ সিংহাসন অধিকার করে তাকেই আমরা মানি।'

হাবশী কুলের শ্রেষ্ঠ রাজা সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহ গৌড় শহরে একটি মসজিদ, একটি মিনার ও একটি জলাধার তৈরি করিয়েছিলেন। মিনারটির নাম ফিরোজ মিনার। যে রাজমিস্ত্রী মিনার তৈরির দায়িত্বে ছিলেন, তিনি খবর পাঠালেন, নির্মাণ-কাজ শেষ। সুলতান দেখতে এলেন। চূড়ার উপরে উঠলেন। রাজমিস্ত্রী খুব গর্ব করে বলছেন, 'এর চেয়ে অনেক উঁচু মিনার আমি তৈরি করতে পারতুম।'

সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, 'করলে না কেন?'

রাজ বললেন, 'এত মালমশলা আমার কাছে ছিল না যে।'

সুলতান রেগে গেলেন, 'ছিল না তো আমার কাছে চাইলে না কেন?'

রাজমিস্ত্রী নিরুত্তর। রাজা ক্রোধে গর্জন করে উঠলেন, 'এটাকে নিচে ফেলে দে?' সঙ্গে সঙ্গে রাজ-আদেশ পালিত হল। রাজমিস্ত্রীর ভবলীলা সাঙ্গ হল। সুলতান চূড়া থেকে নেমে এসে প্রিয় ভৃত্য হিঙ্গাকে আদেশ করলেন, 'এক্ষুনি মোরগাঁওয়ে যা।'

হিঙ্গা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ল। রাজা রেগে আগুন হয়ে আছেন। মিনারের নিচে পড়ে আছে রাজমিস্ত্রীর মৃতদেহ। হিঙ্গা ভয়ে জিজ্ঞেসই করতে পারল না মোরগাঁওয়ে গিয়ে সে কি করবে!'

হিঙ্গা মোরগাঁওয়ে পৌঁছে ভাবছে, এবার সে কি করবে। এক জায়গায় বসে অনুমান করার চেষ্টা করতে লাগল, কি কারণে রাজা পাঠাতে পারেন! সাধারণ বুদ্ধি কি বলে! সাধারণ বুদ্ধি কিছুই বলছে না। হিঙ্গা তখন এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। এমন সময় এক যুবকের সঙ্গে আলাপ হল। ব্রাহ্মণ সন্তান। নাম সনাতন। হিঙ্গা সেই যুবককে তার সমস্যার কথা খুলে বলল। কি কাজে রাজা এখানে পাঠাতে পারেন!

সনাতন বললেন, আগের ঘটনা কিছু বল। এখানে আসার জন্যে যখন বেরলে ঠিক তার আগে কি হয়েছিল?

হিঙ্গা মিনার ও মিস্ত্রীর কথা বলল।

সনাতন বললেন, বুঝেছি। সুলতান তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন ভাল ভাল রাজমিস্ত্রী নিয়ে যাওয়ার জন্যে। এই জায়গা দক্ষ রাজমিস্ত্রীদের জন্য বিখ্যাত। হিঙ্গা সনাতনকে তার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কয়েকজন অতি দক্ষ রাজমিস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল।

সুলতানের ক্রোধ ইতিমধ্যে কমেছে। বসে আছেন আর ভাবছেন, হিঙ্গাকে ত পাঠালুম, কি জন্যে তা ত বলা হল না! আর ঠিক সেই সময় রাজমিস্ত্রীদের নিয়ে হিঙ্গার প্রবেশ। সুলতান অবাক, এরা কারা? জাঁহাপনা, এরা সব রাজমিস্ত্রী।

— তোকে ত কিছু বলিনি। তুই আমার মনের কথা জানলি কি করে?

— জাঁহাপনা আমার বুদ্ধিতে হত না। একজনের সঙ্গে দেখা হল। তার নাম সনাতন। তাকে সব বলে পরামর্শ চাইলুম। সনাতন বললে, সুলতান তোমাকে রাজমিস্ত্রী ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পাঠিয়েছেন। সুলতান খুব খুশী হলেন। অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাঁর। নিয়ে এস সনাতনকে।

ফিরোজ শাহ সনাতনকে উচ্চপদে নিয়োগ করলেন। আর রাজমিস্ত্রীরা ফিরোজ মিনারের উচ্চতা আরও অনেকটা বাড়ালেন। এই সনাতনই হোসেন শাহের আমলে মন্ত্রী হলেন এবং রাজসভায় বসতেন। সনাতনের ছোট ভাই রূপও মন্ত্রী ছিলেন। কবি। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। ইনি সংস্কৃতে কয়েকটি লৌকিক কাব্য ও নাটক লিখেছিলেন। বিষয়, কৃষ্ণলীলা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অলঙ্কারশাস্ত্র রচনা করেছিলেন — 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু', 'উজ্জ্বল নীলমণি'। বিখ্যাত একটি পদ্যসঙ্কলন গ্রন্থ প্রস্তুত করেছিলেন — 'পদ্যাবলী'।

মানুষের ইতিহাস, জানোয়ারের ইতিহাস যুদ্ধে ভরা। যুদ্ধ ছাড়া পৃথিবী অচল। রাজা হয়েছি, সিংহাসনে বসেছি, যুদ্ধ করব না? প্রজাপালন মানে প্রজাপীড়ন। এ রাজা একটু দরদী, ত পরের রাজা দলনকারী। শ্রীকৃষ্ণ সেই কারণেই যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের রথের সারথি। আর শ্রীকৃষ্ণাবতার শ্রীচৈতন্য যুদ্ধমাড়িয়ে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করছেন।

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। চলেছেন নীলাচলে। জানুয়ারী, ১৫১০। উড়িষ্যার সঙ্গে বাঙলার যুদ্ধ চলেছে। ছত্রভোগে দুই রাজ্যের সীমানা। সীমান্তরক্ষী রামচন্দ্র খান মহাপ্রভুকে সীমান্ত পার হতে সাহায্য করছেন। দুবছর বাদে, ১৫১২ সালে মহাপ্রভু দক্ষিণভারত পর্যটন করে নীলাচলে ফিরছেন। যুদ্ধ তখন প্রায় শেষ। যুদ্ধ আবার শুরু হল ১৫১৫ সাল থেকে।

মহাপ্রভু নীলাচলকে বঙ্গবাসীর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন। প্রতি বছর রথের সময় বাঙলার ভক্তরা তাঁকে দর্শন করার জন্যে নীলাচলে যেতেন। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে হোসেন শাহ আবার উড়িষ্যা আক্রমণ করায় ভক্তরা বাঙলা থেকে যেতে পারেননি। মহাপ্রভুই নিষেধ করেছিলেন। বাঙলা থেকে নীলাচলে ফেরার সময় মহাপ্রভু বললেন,

সভা সহিত ইহা মোর হইল মিলন।
এ বৎসর নীলাদ্রি কেহ না করিহ গমন॥

প্রতাপরুদ্র যখন বাঙলা আক্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন মহাপ্রভু তাঁকে উপদেশ দিলেন, ওই কাজটি করো না। বাঙলার সুলতানের অসীম শক্তি। মহাপ্রভুর সর্বাধিক চিন্তার বিষয় ছিল প্রভু জগন্নাথদেবের মন্দির। যুদ্ধ মানেই ধ্বংস। কিন্তু রাজা ত! যুদ্ধ একটা চাই। প্রতাপরুদ্র বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন। মহাপ্রভু তখন নীলাচলে।

এরপর, যেমন নাটকে বলে বাঙলার ভাগ্যাকাশে বাবরের উদয়। ১৫২৯ সাল। শাহী বংশের নসরৎ শাহ তখন বাঙলার সুলতান। যাকে বলে ঘোর

যুদ্ধ। অবশেষে সন্ধি। বাঙলার অনেকটা অংশ বাবরকে দিতে হল। নসরৎ শাহ অতি সুযোগ্য শাসক ছিলেন, অবশ্যই পাকা ডিপ্লোম্যাট।

বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন বাংলা আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। শেষে সাহস পেলেন না। বাঙালি গোলোন্দাজদের বীরত্বের কথা জানতেন। সর্বোপরি নসরৎ শাহের ডিপ্লোমেসি।

কাল শেষ হয়ে আসছে। সমুদ্র খুলে গেছে। পাহাড় আর গিরিখাত ত সাহসীদের জন্যে সদা উন্মুক্ত। আর ঘোড়া ত শ্রেষ্ঠ বাহন! আর হাতি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। আর মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা।

ধীরে ধীরে পর্তুগীজরা বাঙলায় কায়েম হচ্ছে। প্রথমে এলেন ভূ-পর্যটক হয়ে ভাস্কো-দা-গামা। ১৪৯৮ সালে। তিনি ভাগ্যান্বেষী, বণিক। বাঙলা সম্পর্কে লিখলেন, 'বেন্‌গুআলা (বাঙলা)-র রাজা মুরিশ। অর্থাৎ মুসলমান। এখানে খ্রীষ্টান ও মুর উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের বাস।' খ্রীষ্টান কোথায় পেলেন? প্রশ্ন আসে। তিনি তৎকালীন সুলতানের সমরশক্তির উল্লেখ করেছেন, 'সৈন্যসংখ্যা প্রায় ২৪ হাজার। রণহস্তীর সংখ্যা চারশো।' এরপর বাঙলার সম্পদের বিবরণ — 'প্রচুর গম হয়, উন্নতমানের তুলো হয়। দামী তুলোর জিনিস রপ্তানী হতে পারে। এখানে যে কাপড় বাইশ শিলিং ছ পেনি দামে বিক্রি হয়, তা কালিকটে বিক্রি করে নব্বই শিলিং পাওয়া যায়। এখানে প্রচুর রুপো পাওয়া যায়।'

১৫০৩ থেকে আটের মধ্যে আর এক পর্তুগীজ এলেন। বিখ্যাত নাবিক ম্যাগেলান এর আত্মীয়। এঁর নাম দুয়ার্তে বারবোসা। সারা ভারত ঘুরেছিলেন। এঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে দিউ-এর বর্ণনা পাওয়া যায়। ওরমুজ অধিকারের উল্লেখ আছে। কালিকটে পর্তুগীজদের ভারতীয় জাহাজ দখল করে সামুদ্রিক বাণিজ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করার কথা আছে। বাঙলার যাবতীয় সম্পদের অপূর্ব বর্ণনা আছে। কৃষিপণ্য, মূল্যবান খনিজ সম্পদ, অতি উচ্চমানের বস্ত্রাদি। আখ, উন্নতমানের চিনি। এমন কি মদ।

কি ছিল এই বাঙলা! ইংরেজ কেন আসবে না! তোমে পিরেস আর এক পর্তুগীজ। তাঁর বাঙলা-বর্ণনা আরও চমকপ্রদ। লিখছেন, 'বাঙলা থেকে মালাক্কায় প্রতিবছরে একবার একটি করে জাঙ্ক যায় — কোন কোন বছরে দুবারও যায়। প্রতিটি জাঙ্ক পর্তুগীজ মুদ্রায় ৮০ থেকে নব্বই হাজার ক্রুজেডো মূল্যের পণ্য বহন করে। তারা মালাক্কায় নিয়ে আসে সূক্ষ্ম সাদা কাপড়,

সাত রকমের সিনাবাফো, তিন রকমের চাদর, মসলিন, বেইরেম। এছাড়া আরো সব দামী জিনিসপত্র। তা প্রায় কুড়ি রকমের। নিয়ে আসে ইস্পাত। খুব দামী, নানা রঙের অতি সুন্দর মশারি — তাতে কাটা কাপড়ের কাজ করা। আনে পর্দা, দেয়ালে ঝোলাবার অনেক জিনিস। চিনি জমিয়ে তৈরি করা নানা সুখাদ্য। প্রচুর পরিমাণে। আরও আনে, সযত্নে রক্ষিত হরীতকী, আদা, কমলালেবু, শশা, গাজর, সর্ষে, লেবু, সাফারজাল (এক রকমের ফল। ইংরেজি Quince) ডুমুর, কুমড়ো, লাউ, আরও নানা রকমের ফল। এদের মধ্যে কয়েকটি থাকে ভিনিগারে ডোবানো। প্রচুর পরিমাণে কালো পাথরের সুগন্ধযুক্ত পাত্র নিয়ে আসে। মালাক্কায় যার খুব কদর। দামেও শস্তা।'

পর্তুগীজ আর ইংরেজ কে হারে কে জেতে! কে হয় ভারত ভাগ্যবিধাতা! ১৪৯৮ সাল, ভাস্কো-দা-গামা কালিকট বন্দরে অবতরণ করলেন। হোসেন শাহ তখন বাঙলার সুলতান। এই হল শুরু। বাঙলায় বাণিজ্য করার অনুমতি মিলল না। না মিললেও, মানুষের মাথার ওপর বসে আছেন নিয়তি। অতীতের দিকে তাকালে দেখা যাবে ক্ষমতার লড়াইয়ের কোস্তাকুস্তির মধ্যে দিয়েই সাধারণ মানুষকে হেঁটে আসতে হয়। নদীতে যেমন উথালপাথাল ঢেউ। ভাস্কোডাগামা, কেউ লেখেন ভাস্কোডিগামা, ভাস্কো-দা-গামা, তা গামা নতুন দেশ কালিকটে নেমে এক মন্দিরে প্রবেশ করলেন। দুর্গাদেবীর মন্দির। তিনি মনে করলেন, মাতা মেরীর মন্দির। পূজার গঙ্গার জলকে জরডনের জল ভেবে পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করলেন। কোথায় কালিকট আর কোথায় বাঙলা। বাঙলার আগামী পঞ্চাশ বছরের ভাগ্য তৈরি হয়ে গেল। হোসেন শাহের আমলে বাঙলায় ঢুকলেন। যাঁরা এলেন তাঁদের নাম কোয়েলেহ, সিলভিরা। আড্ডা তৈরি হল। অনেকটা কাবুলিওয়ালাদের ঘাঁটির মতো। এদের অধিনায়ক মেলো বাণিজ্যের নামে অত্যাচার করার অভিযোগে গৌড়ে বন্দী রইলেন কিছুকাল। অবশেষে চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম আর হুগলী এদেব বাণিজ্যকেন্দ্র হল।

হোসেন শাহের পর বাঙলায় মামুদ শাহের রাজত্বকাল। শের খাঁ আসছেন বাঙলা আক্রমণে। দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্যের শত্রু মামুদ শাহ পর্তুগীজদের সাহায্যে আক্রমণ প্রতিহত করলেন। ঠিক প্রতিহত করেছেন বললে ভুল হবে, ব্যাপারটা খুব মজার। শের খাঁন ছিলেন বিহারে। জালাল লোহনীর অভিভাবক। শের খানের অভিভাবকত্ব বেশিদিন সহ্য করতে না

পেরে মাহমুদের কাছে গিয়ে তাঁর অধীনতা স্বীকার করলেন এবং অনুরোধ জানালেন শের খাঁকে খতম করুন। তিনি ইব্রাহিমকে শের খাঁর বিরুদ্ধে পাঠালেন। সঙ্গে প্রচুর সৈন্য হাতি ও কামান। বিশাল বাহিনীকে দেখে শের খাঁ বাংলার দিকে পালাতে লাগলেন। মুঙ্গের আর পাটনার মাঝখানে, মুঙ্গেরের তের ক্রোশ দূরে দু-দল মুখোমুখি হল। শের খাঁ চারিদিকে মাটির প্রাকার তৈরি করে ছাউনি ফেললেন। ইব্রাহিম ছাউনি ঘিরে ফেলে তোপ বসালেন। প্রাকারের মধ্যে থেকে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে শের খাঁ ইব্রাহিমের কাছে দূত পাঠিয়ে জানালেন তিনি পরের দিন সকালে প্রাকার থেকে বেরিয়ে তাঁকে আক্রমণ করবেন।

এদিকে শের খাঁ রাত শেষ হবার আগেই প্রাকারের মধ্যে বাছাবাছা অল্প সৈন্য রেখে আর সব সৈন্যদের নিয়ে উঁচু জমির আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সকালে ইব্রাহিমের সৈন্যরা যখন এল তখন শের খাঁর ঘোড়সওয়ার সৈন্যরা একবার তীর ছুঁড়েই পিছু হঠল। তখন আফগানরা পালিয়ে যাচ্ছে ভেবে বাংলার ঘোড়সওয়ার সৈন্যরা তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করল। শের খাঁ তার লুকনো সৈন্যদের নিয়ে বাংলার সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। বাংলার সৈন্যরা পালিয়ে না গিয়ে স্থির হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। বাংলার বাহিনী পরাজিত হল। ইব্রাহিম নিহত হলেন। তাঁদের সমস্ত হাতি তোপ এবং অর্থভান্ডার শের খাঁর দখলে এল।

এরপরে শের খাঁ তেলিয়াগড়ি ও সক্রীগলির গিরিপথ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করলেন। মাহমুদের সেনাপতিরা ও পর্তুগীজ সেনাপতি জোআঁ-কোরীআর অতুলনীয় যুদ্ধে শের খাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। এরপর শের খাঁ ঝাড়খন্ডের মধ্যে দিয়ে গৌড়ে ঢুকে পড়লেন। তখন নির্বোধ মাহমুদ শাহ তের লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে শের খাঁর সঙ্গে সন্ধি করলেন। এইটাই হল তাঁর পরবর্তী পতনের কারণ। তার কারণ এই অর্থে শের খাঁ তাঁর শক্তি বাড়িয়ে আবার গৌড় আক্রমণ করলেন এবং পর্তুগীজদের লেখা থেকে জানা যায় সহরটিকে জ্বালিয়ে দিয়ে প্রায় ধ্বংস করেছিলেন। নির্বিচারে লুঠ চালিয়ে ছ-কোটি স্বর্ণ মুদ্রা হস্তগত করেছিলেন।

এইভাবে পর্তুগীজরা তাদের অধিকার বিস্তার করতে থাকে। ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে পর্তুগীজরা চট্টগ্রাম সম্পূর্ণ অধিকার করে নিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘাঁটি শক্ত করল আর দেশবাসীর ওপর অত্যাচার। তারপরে যেমন বলে রতনে রতন চেনে। মগদের সঙ্গে দোস্তি হল। তারপরে উভয় মিলে

বঙ্গদেশে লুটপাট। পর্তুগীজদের শক্তি এত বাড়ল যে শেষে মগদের রাজত্ব আরাকানটাই দখল করে ফেলে আর কি! তখন আরাকান-রাজ সমস্ত পর্তুগীজকে খতম করার আদেশ দিলেন। সন্দ্বীপের মোগল শাসনকর্তা ও সেখানকার পর্তুগীজরা নিহত হল। কিন্তু জলযুদ্ধে ভীষণ ওস্তাদ পর্তুগীজদের সঙ্গে পেরে ওঠা ভীষণ মুশকিল। আত্মপ্রকাশ করলেন সিবাস্তিয়ান গঞ্জালেসের ক্ষমতা অসম্ভব বেড়ে গেল। তিনি সন্দ্বীপের রাজা হয়ে বসলেন। সন্দ্বীপের সমস্ত মুসলমানকে মেরে শেষ করে দিলেন। তাঁর ক্ষমতা দেখে আশেপাশের রাজারা তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এলেন। ওদিকে আরাকানে এমন একটি ঘটনা ঘটল যার ফলে গঞ্জালেসের আরও সুবিধে হয়ে গেল। ঘটনাটি এই — আরাকান-রাজের ভাই অনাপরম কোনও অপরাধের জন্যে দন্ডিত হলেন। ফলে তাঁর দাদা হলেন পরম শত্রু। অনাপরম গঞ্জালেসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করলেন। প্রথমে নিজের সুন্দরী বোনের সঙ্গে গঞ্জালেসের বিয়ে দিলেন। আর দিলেন প্রচুর অর্থ। তারপরে দুজনে মিলে দাদাকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু আরাকান-রাজের সঙ্গে পেরে উঠলেন না। এতে গঞ্জালেসের কোনও ক্ষতি হল না। তিনি সুন্দরী স্ত্রী পেলেন, প্রচুর অর্থ পেলেন। তারপরে যুবরাজের মৃত্যুর পর তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করলেন। এরপরে আরাকানের রাজার সঙ্গে তাঁর দোস্তি হয়ে গেল। উভয় মিলে বাংলাদেশ অভিযান করে লক্ষীপুর পর্যন্ত দখল করে নিলেন। ইতিমধ্যে মোগলরা এক বিরাট বাহিনী নিয়ে দুজনকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করলেন। আরাকান-রাজ ও গঞ্জালেস কোনও রকমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচলেন। গঞ্জালেস এক দুর্বৃত্ত, তিনি করলেন কি মগরাজের কয়েকজন অমাত্যকে সন্ধির একটা প্রস্তাব করবার ছলে নিজের জাহাজে এনে হত্যা করলেন। তারপর গোয়ার শাসনকর্তার অধীনতা স্বীকার করে তাঁকে আরাকান রাজ্য অধিকারের লোভ দেখালেন। গোয়া থেকে ডন ফ্রান্সিস নামক সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্য এসে গেল। এরা আরাকান রাজ্যের প্রান্তভাগ লুঠ করতে থাকল। আরাকানের রাজা তখন গুলন্দাজদের সাহায্যে পর্তুগীজদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করলেন। ডন ফ্রান্সিস নিহত হলেন। গঞ্জালেস পালালেন। সন্দ্বীপ আরাকান-রাজের দখলে চলে এল। এইবার এই ঘূর্ণির অবসান। নবাব শায়েস্তা খাঁ আরাকান-রাজকে পরাস্ত করে সেনাপতি হুসেন বেগের সাহায্যে মোগলের নষ্ট ক্ষমতা উদ্ধার করলেন। পঞ্চাশ বছর ধরে মগ আর পর্তুগীজদের মিলিত অত্যাচার থেকে বাংলাদেশের মুক্তি। পর্তুগীজ দস্যুরা

গর্ব করে বলত 'পাদ্রীরা দশ বছরের চেষ্টায় যত লোককে খৃষ্টান করেছে আমরা এক বছরে তার অনেক বেশি করেছি।' মোগলরা যখন চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ দখল করল তখন মগেরা ১২২৩টি কামান ফেলে যায় আর তাদের সমস্ত ধনরত্ন মাটিতে পুঁতে রেখে যায়। ফলে মোগলরা সেইসব ধনরত্নের সন্ধান পেল না। আরাকানরাজের সৈন্যবাহিনীতে অনেক পর্তুগীজ সৈন্য ছিল। এরা কোনও মাইনে পেত না। রাজা বলে দিয়েছিলেন, বাংলাদেশটা তোমাদের জায়গীর যা পার লুটেপুটে নাও। ফলে বার মাস বাংলাদেশে এরা লুটপাট হরণ এবং অত্যাচার চালাত। এই সময় আমরা আর এক সাংঘাতিক পর্তুগীজের নাম পাই — কার্ভালো। এই চরিত্রটিকে আমরা আধুনিককালের কোলকাতার থিয়েটারেও দেখেছি ঐতিহাসিক পালায়। এই অত্যাচারি কার্ভালোকে প্রতাপাদিত্য কায়দা করে ধূম ঘাটে ডেকে এনে হত্যা করেছিলেন। এই একটি ঘটনায় এদেশের পর্তুগীজরা মহা আতঙ্কিত হলেন। বহু পর্তুগীজ পাদ্রী দেশ ছেড়ে পালালেন। এরপর শায়েস্তা খাঁ এসে এদের একেবারে শায়েস্তা করলেন। চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগীজ আর মগেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মগেরা এত দ্রুত পালাল 'মগের মুল্লকে', এমন দ্রুত অবসান হল লোকে এর নাম দিল 'মগ-ধাওনি।' মগেরা পালাবার সময় তাদের দেববিগ্রহ ও অতুল ঐশ্বর্য মাটির নিচে পুঁতে রেখে গিয়েছিল। আরাকানে ফিরে গিয়ে তারা সেইসব গুপ্তস্থানের একটা সাংকেতিক তৈরি করেছিল। বহুকাল পরে দেশে যখন শান্তি ফিরে এল, কাল যখন ইতিহাসের অন্তরালে চলে গেল তখন মগ পুরোহিতেরা মানচিত্র হাতে ধূমকেতুর মতো চট্টগ্রামে উদিত হত। গুপ্ত দেববিগ্রহ আর মণিরত্ন মোহরপূর্ণ কুম্ভ উদ্ধার করে নিয়ে যেত। এখনও নাকি সেই অনুসন্ধান শেষ হয়নি। মানচিত্রধারী মগ পুরোহিতদের মাঝেমাঝেই দেখা যায় ওই অঞ্চলে। কিছুকাল আগে ইংরেজ সরকার পরিচালিত এক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানী চট্টগ্রামের দেয়াঙ্গ পাহাড়তলীতে বহু বুদ্ধ ও অপরাপর বিগ্রহ মাটির নিচে পাওয়া যায় অক্ষত ও উৎকৃষ্ট অবস্থায়। এগুলি সেই মগ-ধাওনির সময়কার। অধিকাংশই বুদ্ধদেব ও গনেশের। ইংরেজ আমলেও মগ দস্যুদের অত্যাচারের কথা এখানে ওখানে শোনা যেত। লঙ সায়েব লিখছেন — ১৮২৪ খৃষ্টাব্দেও কোলকাতাবাসীরা মগদস্যুদের ভয়ে ভীত হত। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গভর্ণমেন্ট গঙ্গায় একটি বাঁধ তৈরি করেছিলেন মগ আর পর্তুগীজ দস্যুদের আসবার পথ বন্ধ করার জন্যে। বাঁধটি ছিল এখনকার বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছে।

সময় কে তৈরি করেন? কালের কর্তা কে? রাজমুকুট তৈরি করেন কোন জহুরী! ভারত হয়ে গেল ইংরেজের। এত ঘোড়া ছুটল! রণ হস্তীর দাপাদাপি। তোপ, তীর, তরোয়াল, কাটাকাটি, মারামারি, অবশেষে ছত্রপতি সেই সাদা চামড়া। বাদামি আর আবলুসরা নিদ্রায় গেল ইতিহাসের চিতায়।

সেই ১৬০০ সাল। ইংলন্ডের রানী এলিজাবেথের দীর্ঘ শাসনকালের সায়াহ্ন। একটি কোম্পানি তৈরি হল — 'দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'। ভারতের অতুল সম্পদের খবর এসে গেছে। ইংলন্ডের ব্যবসায়ীরা নড়েচড়ে বসেছেন। একটা ধাক্কা এসেছে। রানীকে তাঁরা বোঝালেন, আমরা পিছিয়ে পড়ছি। গরিব হয়ে যাচ্ছি। We are several years behind the Dutch in this regard and a century behind the Portuguese. লজ্জার কথা। সমুদ্র আমরাও চিনি। ঝুঁকি আমরাও নিতে পারি। শুধু রানীর অনুমতির অপেক্ষা।

ঠিক আছে। বণিককুল পনের বছরের জন্যে ভারতবাণিজ্যের 'মনোপলি' আপনাদের দেওয়া হল। কোম্পানির বোর্ড মিটিং-এ শেয়ার হোল্ডাররা জানতে চাইলেন, ব্যাপারটা কি হবে! আপনাদের টাকায় কেনা হবে পাঁচটি বাণিজ্যপোত। সরঞ্জামে সাজান হবে। নিযুক্ত করা হবে নাবিক। ভারত থেকে আমরা মশলা, লঙ্কা, মরিচ ইত্যাদি আনব, শুধু ভারত নয়, আমাদের এলাকা হল 'ইণ্ডিজ'। আমরা ফিরে এসে সেই সব বিক্রি করব লন্ডনে। লাভসমেত ফেরত পাবেন শেয়ারের টাকা। তবে জেনে রাখুন আমাদের এই এশিয়া বাণিজ্যে অনেক ঝুঁকি থাকবে। ব্যাপারটা বিশাল। শক্তিশালী প্রতিযোগী অনেক।

বোর্ডরুম খালি হয়ে গেল। অংশীদাররা বিদায় নিলেন লন্ডনের শীত আর কুয়াশায়। শূন্য টেবিলে পড়ে রইল অকথিত কথা উদ্দেশ্য শুধু বাণিজ্য নয়, আরও বেশী, আমরা রাজত্ব চাই। সমুদ্র পারে ইংরেজ শাসিত কলোনি। বণিকের মাণদণ্ড রাজদণ্ড হবে!

ইতিহাস বিস্মিত। ইংলন্ডে এলিজাবেথ, ভারতে আকবর, ওদিকে চীনদেশে মিংডাইনাস্টির ওয়ান-লি, কই ভারত ত পশ্চিমে তরী ভাসাল না। চীনই বা কি করল! The west went east by sea, the east did not sail west of the cape of Good Hope. কোম্পানি হল, রানীর সম্মতি পাওয়া গেল। পাঁচখানা জাহাজ কেনা হল। তার মধ্যে সবচেয়ে বড়

জাহাজটার ক্ষমতা মাত্র ছশো টন। সমুদ্রে প্রতিযোগী দেশের এর চেয়ে অনেক বড় বড় জাহাজ ঘোরাফেরা করে। তবু ইংরেজদের স্ট্যামিনা বীরত্ব এবং কূটনীতি সফল হবে। প্রথম এবং দ্বিতীয় অভিযানে কিছুই হল না। তৃতীয় অভিযানে একটি জাহাজ কূলে ভীড়ল। ১৬০৮ সালের আগস্ট মাস। ক্যাম্বে উপসাগরের সুরাটে নামলেন কোম্পানির প্রতিনিধি উইলিয়াম হকিন্স। তাঁর পকেটে একট চিঠি। লিখছেন ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস সম্রাট জাহাঙ্গিরকে। জাহাঙ্গির সদ্য সিংহাসনে আরোহন করেছেন আকবরের পর। হকিন্সের অভিজ্ঞতা খুব মধুর নয়। সুরাটে পর্তুগীজ ও সম্রাটের মোগল প্রতিনিধিরা তাঁর উপস্থিতি ভাল চোখে দেখেন নি। হকিন্স লিখছেন — আমি ভয়ে দরজা খুলে বাইরে আসার সাহস পেতুম না। কারণ পর্তুগীজ সৈন্যরা সব সময় বাইরে ঘোরাফেরা করত আমাকে খুন করার জন্যে। অবশেষে সম্রাটের প্রতিনিধিদের প্রচুর উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করে হকিন্সের আগ্রা যাত্রা।

আগ্রায় জাহাঙ্গিরের রাজসভায় তিনি গৃহীত হলেন এমন কি একজন স্ত্রীও লাভ করলেন। কিন্তু বাণিজ্য করার সনদ লাভ করলেন না।

একেই বলে ভাগ্য! সেই সনদ লাভ করলেন অন্যভাবে ১৬১২ সালে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দুটি জাহাজ চারটি পর্তুগীজ জাহাজকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে যুদ্ধে পরাস্ত করে ধ্বংস করে দিল। ইংরেজ সামুদ্রিক শক্তি ও বিরাট সাফল্যের সংবাদ সম্রাটের কাছে পৌঁছল। মোগল রাজাদের জলে যুদ্ধ করার ক্ষমতা ছিল না বললেই হয়। প্রতি বছর হজ যাত্রী ভারতীয় মুসলিমরা সমুদ্রে পর্তুগীজদের দ্বারা আক্রান্ত হত। জাহাঙ্গির দেখলেন এই ইংরেজদের শক্তি মক্কাযাত্রীদের সমুদ্র পথ নিরাপদ করতে পারে। এই স্বার্থটি বাণিজ্যের চেয়ে বড়। তিনি কোম্পানির প্রতিনিধিকে বাণিজ্যের অনুমতি দিলেন এই শর্তে যে তারা ভারতের পশ্চিম উপকূলের সমুদ্রপথ হজযাত্রীদের জন্যে নিরাপদ করবেন। কিন্তু সুরাট অথবা আগ্রায় ফ্যাকট্রি করতে দিলেন না।

এইবার জনগণের খেলা। সুরাটের সাধারণ মানুষ ইংরেজদের রক্ষাকর্তা হিসেবে সমাদর জানালেন। কারণ স্থানীয় মানুষ বহুদিন ধরে সম্রাটের কর্মচারি ও পর্তুগীজদের দ্বারা নানাভাবে অত্যাচারিত হচ্ছিলেন। সুরাটে প্রাথমিক ভাবে জনসাধারণের অভ্যর্থনা পেলেও পরে তারা ইংরেজদের

তাদের ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে আর ভাল চোখে দেখল না। ইংরেজের আগমনে সুরাটের জনজীবন আরও অশান্ত হল। নাবিকদের বেচাল সেইসঙ্গে পর্তুগীজদের সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে ইংরেজদের সংঘর্ষ।

এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে কোম্পানি ইংল্যান্ড থেকে এক জাঁদরেল প্রতিনিধিকে সুরাটে আসার জন্যে অনুরোধ জানালেন। ১৬১৫ সালে দূত হিসেবে স্যার টমাস রো সুরাটে এসে নামলেন। ইংরেজদের স্টাইলই আলাদা। স্যার রো যখন জাহাজ থেকে নামছেন তখন আটচল্লিশ বার কামান দেগে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। সুরাট চমকে গেল। কে এই শ্বেতকায় রাজা, যার সাজপোষাক দেখলে চোখ ঠিকরে যায়! তিনি মোগল সম্রাটের জন্যে প্রচুর উপহার নিয়ে এসেছেন যা অতি মূল্যবান এবং সুন্দর।

স্যার রো বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে নরম করতে না পারলেও গুজরাটের ভাইসরয় সাজাহানের সঙ্গে একটা চুক্তি করতে পারলেন। সাজাহান সুরাটে জমি লিজ নেওয়ার অনুমতি দিলেন। আর বললেন কোম্পানির কর্মচারিরা জাহাজের বাইরে এসে ঘোরাফেরা করতে পারবে কিন্তু কোনও অস্ত্র বহন করতে পারবে না। এই ভাবেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হেড কোয়ার্টার হল সুরাটে। মোগল এলাকার বাইরে পূর্ব উপকূলে কোম্পানি একটি ফ্যাকট্রি স্থাপন করলেন গোলকন্ডার প্রধান বন্দর মসলিপত্তমে। আর একটি ফ্যাকট্রি স্থাপন করলেন আরামগাঁওয়ে।

১৬৩৫ সালে গোয়ার পর্তুগীজদের সঙ্গে একটা বৈঠক হল। সেই বৈঠকে উভয়ের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হল অশান্তি অনেক কমল। আরমাগাঁওয়ে কোম্পানির যে ফ্যাকট্রি, সেই ফ্যাকট্রি প্রতিনিধিদের সঙ্গে চন্দ্রগিরির নাবালক হিন্দু রাজপুত্রে একটি চুক্তি হল। চুক্তি অনুসারে কোম্পানি মাদ্রাসাপত্তম অঞ্চলটির অধিকার লাভ করলেন। পরে যার নাম হল মাদ্রাজ। এইটিই হল ভারতে কোম্পানির একমাত্র ভূসম্পত্তি। এর নাম দিলেন ফোর্ট সেন্ট জর্জ।

ইংরেজের ভাগ্যলক্ষী বসেছিলেন কলকাতাতেই। লুকিয়ে ছিলেন বলা চলে। কি ছিরি তখন কলকাতার! গভীর জঙ্গল জলাভূমি জন্তুজানোয়ার — একটি দুরধিগম্য জায়গা। কলকাতার পাশেই সুতানুটি। এইখানেই এলেন জব চার্ণক। স্থাপন করলেন ইংরেজের উপনিবেশ। সেই উপনিবেশের চেহারাও তেমনি। সবই মাটির ঘর, কর্মচারিরা তাঁবু খাটিয়ে বাস করেন।

কিছু থাকে। হুগলি নদীতে বোটের ওপর। কোম্পানির প্রচুর মালপত্র সম্পত্তি আর জাহাজ রক্ষা করার জন্যে একশ গোরা সৈন্যই সম্বল। সুতানুটিতে সেই সময় অনেক পর্তুগীজও থাকতেন। তাঁদের একটি প্রার্থনাগৃহ ছিল সেইটি মোটামুটি পাকা বাড়ি। দ্বিতীয় পাকা বাড়ি একালের লালদীঘির কাছে মজমদারদের কাছারি বাড়ি। কে এই মজুমদার? লক্ষীকান্ত মজুমদার। বেহালা বড়িষার চৌধুরি জমিদারদের আদিপুরুষ। চার্নক মজুমদার বংশীয় চৌধুরি মশাইয়ের কাছ থেকে তাঁর কাছারিটি জমা নেন। পুরো নাম বিদ্যাধর রায়চৌধুরি। এঁর এক নায়েবের নাম ছিল অ্যান্টনি সায়েব। এই অ্যান্টনি সায়েবের নাতি কবিয়াল আন্টুনি ফিরিঙ্গি।

চার্ণকের পর ইংরেজের ভাগ্য ফেরালেন এক ডাক্তার। তাঁর নাম ডাক্তার হ্যামিল্টন। দিল্লীর সিংহাসনে তখন ফেরোকসিয়ার। ইংরেজরা তাঁর কাছে এক প্রতিনিধি দল নিয়ে গেলেন। সেই দলে ছিলেন জন সর্মান, এডওয়ার্ড স্টিফেনসন ও ডাক্তার হ্যামিলটন। সম্রাটের জন্যে তাঁরা প্রচুর উপহার নিয়ে গেলেন। ওই দলে আর একজনও ঢুকে পড়েছিলেন। তাঁর নাম খোজা সারহদ। তিনি একজন ধনী আর আরমানি সওদাগর। তিনিই হলেন দোভাষী। উপহার সামগ্রীর মধ্যে ছিল নগদ ১০০১ মোহর। টেবিলে রাখবার মণিমুক্তাখচিত একটি বহুমূল্য ঘড়ি, সারা বিশ্বের একটি মানচিত্র। এছাড়া আরও অনেক কিছু।

এই সময়ে যোধপুরের রাজা অজিত সিংহের রূপসী কন্যার সঙ্গে বিবাহের আয়োজন হচ্ছিল। ইংরেজ প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানাবার কয়েকদিন পরেই বাদশাহ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিছুতেই সেই অসুখ আর সারে না। তখন হ্যামিল্টন সায়েব সম্রাটকে বলে পাঠালেন, 'সকলেই তো আপনার চিকিৎসা করলেন, এখন একবার আমায় চেষ্টা করতে দিন।' সম্রাট সম্মতি জানালেন। হ্যামিল্টন সায়েবের চিকিৎসায় তিনি আরোগ্য লাভ করে প্রকাশ্য দরবারে ডাক্তার হ্যামিল্টনকে সম্মান জানালেন। তাঁকে দিলেন — এক বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণিমুক্তাখচিত একটি কলগা, বহুমূল্য একজোড়া হীরের আংটি, একটি হাতি, একটি ঘোড়া আর নগদ পাঁচ হাজার টাকা। সম্রাটের বোধহয় কার্বাঙ্কল হয়েছিল, ডাক্তার যে অস্ত্র দিয়ে অস্ত্রপোচার করেছিলেন সম্রাট সেই অস্ত্রগুলিকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেবার আদেশ দিলেন। এছাড়াও একসেট হীরে বসানো সোনার বোতাম দিলেন। আর একটি সোনা দিয়ে বাঁধান মণিখচিত চুল আঁচড়াবার বুরুশ দিলেন।

যে কারণে যাওয়া তখনও পর্যন্ত তার কিছুই হয়নি। প্রতিনিধিদল দিল্লীতে গিয়েছিলেন জুলাই মাসে। নভেম্বর শেষ হতে চলল। ডিসেম্বর মাসে সম্রাটের বিয়ে হল মহাসমারোহে। তারপরও আরও কমাস কাটল। অবশেষে ১৭১৭ সালের জুন মাসে ইংরেজরা তাঁদের প্রার্থীত বাদশাহী-ফারমান পেলেন। কেবল ফারমান নয় ইংরেজরা কলকাতার চারপাশে আটত্রিশ খানি গ্রামের জমিদারি সত্ত্ব কেনবার অনুমতিও পেলেন।

রোগমুক্ত সম্রাট ডাক্তার হ্যামিল্টনকে কিছুতেই ছাড়তে চান না। এ কমাস তাঁকে দরবারেও বসতে হয়েছে। শেষে ছুতো করে তিনি কলকাতায় ফিরে আসতে পারলেন। ফিরে আসার পরেই তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। যে সমাধিক্ষেত্রে চার্ণককে সমাহিত করা হয়েছিল সেই সেন্ট জন গির্জার নির্জন সমাধিতেই তাঁকে সমাহিত করা হল।

এইবার সারা ভারতকে ক্ষমতায় আনার কাজটি করবেন ইতিহাস বিখ্যাত রবার্ট ক্লাইভ। ইংরেজদের পথ পরিষ্কার করার জন্যে ভাগ্যলক্ষ্মী একের পর এক অপদার্থ রাজাদের ক্ষমতার সিংহাসনে বসাবেন। দেশের কুচক্রী মানুষদের ক্ষমতার বলয়ে নিয়ে আসবেন। বিশ্বাসঘাতকদের প্রস্তুত করবেন, গুপ্তঘাতকদের তৈরি রাখবেন অন্তরালে। কেন? না ক্লাইভ আসছেন, রবার্ট ক্লাইভ পশ্চিম থেকে আসছেন পূর্ব দিগন্তে বৃটিশ সূর্যকে উদিত করতে।

অতীতের লোহার দরজা বন্ধ করা যাক, ভেতরে ঘুরে বেড়াক মোগল পাঠান মগ পর্তুগীজ হাবসি প্রেতাত্মার দল। মাঝে মাঝে কান পেতে শোনা যেতে পারে অপসৃয়মান কালতরঙ্গের উচ্ছ্বাস। সগর্জনে ভাসিয়ে নিয়ে যায় মানুষের সমরোপকরণ, রণহস্তি, আরবি ঘোড়া। সবই ভেসে যায়! বৃষ্টির পর যেমন সুনীল আকাশের তলায় গ্রামখানি হেসে ওঠে, পড়ে থাকা কোনও শান্ত রাজার আম্র কাননটি শিশুদের কলকাকলিতে মুখর হয়। ঠিক সেইরকম একটি আম্রকাননও পলাশীর আম্রকাননের মতো ঐতিহাসিক। পলাশীর আম্রকাননে আমরা স্বাধীনতা হারিয়ে ছিলুম যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার। আর কামারপুকুরের মানিকরাজার আম্রকাননে আমরা সর্বকালের মানুষের হৃদয়-সম্রাটকে পেয়েছিলুম বালক গদাধর নামে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য চলে যাওয়ার পর একটি হাইফেন ছিল, তারপরে আর কিছু ছিল না। সেই ফাঁকের পরে একটি পূর্ণতার আবির্ভাব। মানিকরাজার আমবাগানে বালকটিকে দেখে সময়ের মানুষ ধারণা করতে পারবে না — কোন বিপ্লবের নাম গদাধর!

আপাতত গদাধর মানিকরাজার অন্দরমহলে প্রবেশ করবে, কারণ এই রাজা বালকটিকে বড় ভালবাসেন। ক্ষুদিরাম যে বড় সুন্দর মানুষ। ব্রাহ্মণের সহজাত তেজের সঙ্গে ধর্মের স্নিগ্ধতার অপূর্ব মিলন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভূরশোভা অঞ্চলের মানুষের কাছে যাঁর পরিচয় মানিক রাজা, তিনি ধার্মিক ক্ষুদিরামের বন্ধু। আমার অর্থ, বিত্ত আছে, উপাধি আছে, ক্ষুদিরাম তোমার আছে ধর্ম। সব ঐশ্বর্যের ঐশ্বর্য। এই পৃথিবীর সারবস্তু — ত্যাগ আর বৈরাগ্য।

পিতা ক্ষুদিরাম পুত্র গদাধরকে নিয়ে একদিন রাজবাড়িতে এলেন। গদাধর সমৃদ্ধি সম্পদ দেখতে ভালবাসেন। অভাবের অলক্ষ্মীকে সহ্য করতে পারেন না। দুখচেটে দারিদ্দির দেখতে পারেন না। তাঁর মা চন্দ্রমণি যে চর্মচক্ষে মা লক্ষ্মীকে দর্শন করেছিলেন। বড়দা রামকুমারের বয়েস তখন পনের। চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পড়েন আর যজমান বাড়িতে পূজাদি করে পিতাকে সংসার চালাতে যতটুকু পারা যায় সাহায্য করতেন।

সেবার আশ্বিন মাস। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত। মানিকরাজার ভূরসুবোয় রাজকুমার গেছেন যজমান বাড়িতে লক্ষ্মীপূজা করতে। অর্ধেক রাত চলে গেছে, ছেলে তবু ফেরে না। মা বড় উতলা হয়েছেন। চন্দ্রাদেবী ঘরে থাকতে পারলেন না। বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। তাকিয়ে আছেন ভূরসুবো থেকে আসার গ্রাম্য পথটির দিকে। পূর্ণচন্দ্রের ঝকঝকে আলোয় প্রান্তর ভেসে যাচ্ছে। কেউ কোথাও নেই। চন্দ্রাদেবী একা দাঁড়িয়ে আছেন উৎকণ্ঠা নিয়ে ছেলের আগমন পথের দিকে চেয়ে।

দাঁড়িয়ে আছেন, দাঁড়িয়েই আছেন। রাত বাড়ছে। চাঁদ চলে যাচ্ছে ক্রমশই পশ্চিমে। হঠাৎ দেখছেন ভূরসুবোর দিক থেকে কেউ একজন আসছে। রামকুমার! চন্দ্রাদেবী এগিয়ে গেলেন। না, রামকুমার ত নয়! তরতর করে এগিয়ে আসছে অপূর্ব সুন্দরী এক রমনী। সারা গায়ে গয়না। ঝমঝম শব্দ। চাঁদের আলোয় ঝলমলে। এ কি? এ কোন সাহসী রমনী! এত রাতে, এত গয়না পরে একা এই নির্জন পথে! চন্দ্রাদেবী এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘মা, তুমি কোথা থেকে আসছ?’ সেই সুন্দরী রমনী বললেন, ‘ভুরসুবো থেকে।’

চন্দ্রাদেবী পুত্রের জন্যে বড় উতলা। জিজ্ঞেস করলেন, ‘মা, তুমি কি

আমার ছেলেকে আসতে দেখলে! সে যে কখন গেছে ভুরসুবোয় পুজো করতে! এখনও ত ফিরল না!'

চন্দ্রাদেবী একবারও ভাবলেন না, সম্পূর্ণ অচেনা এই রমনী তাঁর ছেলেকে চিনবেন কেমন করে! সেই সালঙ্কারা সুন্দরী মহিলা বললেন, 'ও মা, তুমি কিছু ভেব না, তোমার ছেলে এই এল বলে। সে যে বাড়িতে পুজো করতে গেছে আমি যে সেই বাড়ি থেকেই আসছি গো!'

এতক্ষণে চন্দ্রাদেবী সেই রমনীকে আরো ভাল করে দেখলেন। কি অসামান্য রূপ! বহুমূল্য পরিচ্ছদ, নতুন ধরনের অলঙ্কার। চন্দ্রাদেবী অবাক হয়ে বললেন, 'মা, তুমি কি মধুর সুরে কথা বললে, কেউ ত এমন বলে না! এত গয়নাগাঁটি পরে, এত রাতে, একা মেয়ে তুমি কোথায় চললে? তোমার কানে তুমি ও কি পরেছ?'

মেয়েটি অল্প হেসে বললে, 'এর নাম কুণ্ডল।'

'চল না মা, আজকের রাতটা আমাদের ঘরে বিশ্রাম করে কাল যেখানে যাবার যাবে।'

মেয়েটি তার মধুর স্বরে বললে, 'তোমাদের বাড়িতে আর একদিন আমি আসব, আজ যে আমাকে দূরে দূরে অনেক জায়গায় যেতে হবে মা!'

চন্দ্রাদেবীকে শান্ত করে সেই সালঙ্কারা রমনী পথ ছেড়ে লাহাবাবুদের সার সার মরাইয়ের দিকে এগিয়ে গেলেন। চন্দ্রমণির বাড়ির পাশেই ধানের মরাই। চন্দ্রাদেবী অবাক হলেন। ওদিকে যায় কোথায়! পথই বা কোথায়! ওদিকে ত লাহাবাবুদের বাড়ি। পথ ভুল করেছে মেয়ে। চন্দ্রাদেবী এগিয়ে গেলেন। দেখতে পেলেন না। নিমেষে অদৃশ্য। তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। কেউ নেই। তখন তাঁর মনে হল, কি দেখলুম আমি! কাকে দেখলুম? কোজাগরীর এই মধ্যরাতে! মা লক্ষ্মীকে নয় ত।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গিয়ে স্বামীকে এই দর্শনের কথা বললেন। ক্ষুদিরাম বললেন, 'তুমি ভাগ্যবতী। মা তোমাকে এমন রাতে কৃপা করে দর্শন দিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে রামকুমার ফিরলেন। সব শুনে তিনিও অবাক। মা তাহলে আমার পূজা গ্রহণ করেছেন! এখন লাহাবাবুদের বাড়িতে অধিষ্ঠিতা!

সেই মায়ের ছেলে গদাধর। গদাধর যে রাজার ছেলে। মহারাজ। পৃথিবীর রাজার সিংহাসন উল্টে যায়। উল্টে যাবেই। মানুষের হৃদয়ের রাজার সিংহাসন উল্টায় না। সে-কথা এখনই বলা যায় কেমন করে! ইতিহাস কি

ঘটনার আগেই লেখা যায়! রামের আগে রামায়ণ! যায়! কুঁড়ি দেখে যেমন গোলাপ বলা যায়!

শিশু গদাধর কামারপুকুরের এক বার্তা। আবির্ভাব। বাতাস। সরোবরের হিল্লোল। গ্রামে আনন্দ এসেছে। মানিকরাজা ক্ষুদিরামকে বললেন, তোমার ছোট ছেলেটিকে একবার নিয়ে এস না। গদাধর, তখন বয়েস মাত্র ছয়, বাবার হাত ধরে রাজবাড়িতে একদিন হাজির। কোনো ভয় নেই, সঙ্কোচ নেই। সবাই যেন কতদিনের পরিচিত। কি মধুর ব্যবহার। বালকটিকে নিয়ে সবাই মেতে গেলেন। সেদিন থেকে গদাধর সকলের প্রিয়।

মানিকরাজার ভাই রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুদিরামকে বললেন, 'সখা, তোমার এই পুত্রটি সামান্য নয়। দেবতার অংশে জন্মেছে। তুমি যখনই আসবে গদাধরকে নিয়ে আসতে ভুলো না। ওকে দেখলে ভীষণ আনন্দ হয়।'

হয় ত এমন হল, ক্ষুদিরাম গদাধরকে নিয়ে যেতে পারেননি বেশ কয়েকদিন, ভুরসুবো থেকে চলে এলেন রাজার প্রতিনিধি, হয় ত কোনও মহিলা, পিতার অনুমতি নিয়ে পুত্রকে নিয়ে গেলেন। রাজবাড়িতে বালক গদাধরের আসর। সারাদিন আনন্দের হিল্লোল। মানিকরাজার বাড়িতে গদাধর এক বিশেষ আকর্ষণ। কয়েকদিন যেতে দেরি হলেই রাজার লোক এসে হাজির। গদাধর যখন ফিরতেন সঙ্গে নানা উপহার। একবার, কয়েকখানি অলঙ্কার নিয়ে ফিরেছিলেন। রাজা চিনেছিলেন রাজাকে।

জয়রামবাটীতে এখনও তিনি আসেন নি।

কামারপুকুরের এই পাড়া, কোন্ পাড়া? কুমোরপাড়া। একটু আগে যা ছিল একতাল মাটি একটু পরেই মৃৎশিল্পীর আঙুলের খেলায় সুন্দর এক ধ্যানস্থ শিব। মা দুর্গার কাঠামো তৈরি। এইবার এক মেটে, দো মেটে, তারপর রোদে জল টানবে, ফাটল ধরবে, তখন প্রলেপ। তেঁতুল বিচি গুঁড়ো করে জলে ফুটিয়ে আঠা তৈরি করে, রঙ মিলিয়ে তৈরি হবে মায়ের বর্ণময়ী মূর্তি। মা কালী। ঘোর মসিবর্ণ! ইনি শ্মশান কালী। ইনি শ্যামবর্ণা। শ্যামাকালী। আরও কত কালী, রক্ষাকালী, দক্ষিণাকালী।

ঠাকুর তুমি বসো আমাদের পাশে। গান শোনাও, আর দেখো কেমন করে মাটি থেকে দেব-দেবী তৈরি হয়। তারপর যেই মন্ত্রপড়া হয়, প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় তখন অন্য রকম। তখন ছুঁতে ভয় করবে। তাঁরা আসেন, তাঁরা চলে যান। আবার আসেন। সকলেই আসেন।

পাশেই পটুয়া পাড়া। মাটির রঙে ছবি আঁকা হচ্ছে। রামায়ন, মহাভারত, পুরাণ, ভাগবতের যত কাহিনী। লম্বা, লম্বা পট। গোল করে গোটান। যত খুলবে তত ঘটনা বেরবে। এই দেখ গদাধর শ্রীমন্ত সদাগরের জাহাজ। মাস্তুলে বসে আছে একটা পাখি। এই দেখ কমলেকামিনী। রেখা আর রঙের খেলা। মানুষের জীবনের সব ঘটনাই রেখা আর রং। রাখলে থাকে, মুছে দিলেই মুছে যায়।

পাঠশালা পাঠশালায় থাক, গদাধর রঙ-রেখা-মাটির পূজারী। বালক সঙ্গীরা অবাক হয়ে দেখে গদাধরের তৈরি মূর্তি, গদাধরের আঁকা ছবি। মাঝে মাঝেই গদাধরকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কোথায় সে?

কত জায়গায় যাত্রাপালা হয়, পুরাণাদি পাঠের আসর। বালক গদাধর সেই আসরে বসে গভীর মনযোগে পালা দেখে, পাঠ শোনে। লক্ষ করে পাঠকের অঙ্গভঙ্গী কেমন, কথা বলার ধরন কেমন, স্বরক্ষেপণ কেমন! শ্রোতাদের আকৃষ্ট করতে পারছেন কি না! পারলে কি ভাবে পারছেন, কোন কৌশলে! শ্রুতিধর গদাধর। যা শোনে তা আর ভোলে না। এই সব আসর তার পাঠশালা। কত কি শেখা হয়ে যায়, যা সাধারণ শিল্পপ্রতিষ্ঠান কোনোদিন শেখাবে না।

ছেলেটি সব দেখে। সব কিছুর খবর রাখে। যেখানে যায় আনন্দ যেন উপচে পড়ে। গদাধর আসছে মানে আনন্দ আসছে। একটা ঢেউ আসছে। একটা প্রভাব আসছে। সব ভুলিয়ে দেবে কিছুক্ষণের জন্যে। পৌরাণিক কাহিনীর চরিত্র ভাবভঙ্গীসহ অভিনয় করে দেখাবে ওইটুকু বালক। সবাই মশগুল। গ্রামের কোনো কোনো অদ্ভুত চরিত্রের মানুষের হাঁটা, চলা, কথা বলার ধরণ নিখুঁত অনুকরণ করে দেখাবে। তখন হাসির রোল।

কিন্তু এই বালকের সবই অদ্ভুত। কখনো সকলের। কখনো কারোরই নয়, একেবারে নিজের। পুকুরের বড় মাছের মতো স্বভাব। জলের উপরে কিছুক্ষণ খেলা করে তলিয়ে গেল গভীরে। আর তার দেখা নেই। পিতা ক্ষুদিরাম গৃহদেবতার সামনে পূজায় বসেছেন। পুত্র অদূরে বসে মনোযোগ দিয়ে পিতার পূজার সমস্ত খুঁটিনাটি লক্ষ্য করছে।

গদাধর মায়ের কথা, বাবার কথা বারে বারে বলবেন, 'আমার জননী মূর্তিমতী সরলতা। সংসারের কিছুই বুঝতেন না। টাকা পয়সা গুণতে

জানতেন না। পেটের কথা পেটে রাখতে পারতেন না। সব বলে ফেলতেন। লোকে তাঁকে 'হাউড়ে' বলত। সমস্ত মানুষকে খাওয়াতে ভালবাসতেন আমার মা। আমার বাবা শূদ্রের দান কখনো গ্রহণ করতেন না। দিনের অধিকাংশ সময় পূজা, জপ, ধ্যানে কাটাতেন।'

পিতা সন্ধ্যাহ্নিকে বসেছেন। কিশোর গদাধর বসে আছে বিপরীতে। আসনে বসে আছেন তার উজ্জ্বলকান্তি, গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহী পিতা। পাঠ করছেন গায়ত্রীর আবাহন মন্ত্র —

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রিচ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোহস্তুতে॥

মন্ত্রউচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পিতার বক্ষদেশ স্ফীত ও রক্তিম হয়ে উঠল। চোখের জলে বুক ভেসে যায়। ক্ষুদিরাম যখন পূজা করেন না, তখন যা করেন, সেও দেবসেবা। মালা গাঁথছেন। রঘুবীরকে সাজাবেন।

গদাধরের অন্তরে ছবি হয়ে থাকবেন পিতা ক্ষুদিরাম। জ্বলজ্বলে অক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে এই কটি কথা — 'মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়ার ভয়ে তিনি পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করেছিলেন। গ্রামের লোকে তাঁকে ঋষির মাতা মান্যভক্তি করত।' এই আমার পিতা, এই আমার মাতা। আমি তাঁদেরই সন্তান।

ক্ষুদিরাম লক্ষ করতেন, গদাধরকে নিষেধ করলে সেই কাজ থেকে বিরত হবে না যদি না যুক্তিগ্রাহ্য হয়। কোরো না বললেই হবে না, কেন করবে না সেটাও বোঝাতে হবে। পাঠশালার পড়া মনে ধরে না। গতানুগতিক। ক্ষুধিরাম তিরষ্কার করতে পারেন না। তখনই তাঁর সেই স্বপ্নদর্শনের কথা মনে পড়ে। ধূসর স্বপ্ন নয় উজ্জ্বল স্বপ্ন। গয়ার গদাধরের মন্দির। জ্যোতির্ময় দেবতা স্মিত হেসে বলছেন, ব্রাহ্মণ, আমাকে যেতে হবে। তুমি আমার পিতা হবে। আমি তোমার সংসারে আসছি।

জন আকর্ষণী শক্তি। গদাধরকে গ্রামের সবাই কেন এত ভালবাসে! এটি ত একটি ঈশ্বরীয় লক্ষণ। গ্রামের ঘরে, ঘরে যে যা ভালমন্দ রাঁধছেন নিয়ে আসছেন গদাধরের সেবার জন্যে। তবু ক্ষুদিরামের দুশ্চিন্তা যায় না। গদাধর বড় জেদী। যা করার সে করবেই। সেই কথাই সে শুনবে, যে-কথা তার হৃদয় স্পর্শ করবে, নচেৎ গদাধর বিদ্রোহী। লোকে কি ভাববে। এই ভাবনা একজন সাধারণ পিতার। ছেলেটি অতিরিক্ত সাহসী। এতটুকু ভয়ডর নেই।

ক্ষুদিরামের বোন রামশীলা কামারপুকুরে এসেছেন। মাঝেমধ্যেই তাঁর উপর মা শীতলার ভর হত। তখন তিনি সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে যেতেন। দেখলে ভয় হত আবার ভক্তিও হত। কামারপুকুরে তাঁর একদিন ওই রকম ভর হল। পরিবারের সকলে দূরে দূরে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন। গদাধরের ভয় নেই। বসে আছে একেবারে কাছটিতে। খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে আবেশ হলে কেমন হয়। পরে গদাধর ইচ্ছা প্রকাশ করলে, 'পিসিমার ঘাড়ে যে আছে সে যদি আমার ঘাড়ে চাপে ত বেশ হয়!'

জমিদার ধর্মদাস লাহা। তাঁর বিধবা কন্যা প্রসন্ন। গদাধর তাঁর প্রাণ। গদাধরকে তিনি চিনেছিলেন। বালক গদাধর কৃপা করে ধরা দিয়েছিলেন। সারাটা দুপুর গদাধর তাঁকে পুরাণের কাহিনী শোনাতেন। মাঝে মাঝে অপূর্ব গান। প্রসন্ন একদিন গদাধরকে জিজ্ঞেস করছেন — 'হ্যাঁ গদাই, তোকে সময়ে সময়ে ঠাকুর বলে মনে হয় কেন বল দেখি? হ্যাঁ রে, সত্যিসত্যিই ঠাকুর মনে হয়। তুই যাই বলিস, তুই কিন্তু মানুষ নোস্।' গদাধর রঙ্গ-রসিকতা করে সব উড়িয়ে দেয়।

চিনু শাঁখারী গদাধরের খেলার সাথী। বয়েস অনেক! বৃদ্ধ! কিন্তু গদাধরের বন্ধু। দুজনের মধ্যে ভীষণ প্রীতির টান। নিত্য কত গান আর গল্প। গদাধর তাঁর দোকানে হাজির হওয়া মাত্রই চিনুর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। আসন এগিয়ে দিয়ে বলতেন, এসো ঠাকুর এসো, বোসো, দুটো প্রাণের কথা, দুটো মনের কথা কই গো বাপ।

দরিদ্র মানুষ। কোনো রকমে সংসার চলে। অভাবে অভাব থাক, স্বভাবে প্রেমানন্দ। সংসারের বিশাল হজমশক্তি হলেও কোনো কোনো প্রাণকে পরিপাক করে মণ্ড বানাতে পারে না। চিনুর কাছে গদাধর তার সচল বিগ্রহ। সামান্য যা সঙ্গতি তাই দিয়েই গদাধর রূপী বিগ্রহের সেবা। কামারপুকুরের সবচেয়ে ভাল যা মিষ্টি তাই কিনে এনে গদাধরকে নিবেদন করেন। গদাধর মহানন্দে একটু একটু খান আর চিনু তৃপ্তিভরা মুখে দেখেন। চোখে জল। খদ্দের এসে দাঁড়িয়ে থাকেন চিনুর হুঁশ নেই!

একদিন চিনু ভোরবেলা সাজি ভরে ফুল তুলে আনলেন। বসে, বসে বড় একটি মালা গাঁথলেন বড় পরিপাটি করে। বড় সুন্দর। গাঁথা মালাটি লুকিয়ে রাখলেন। বাজারে গিয়ে কিনে আনলেন সবচেয়ে ভাল মিষ্টি।

যথাসময় গদাধর এলেন আনন্দের হিল্লোল নিয়ে। চিনু বললেন, চলো ঠাকুর আজ আমরা একটু ফাঁকায় যাই। এমন সুন্দর শরতের সকাল। রোদ্দুরের ঝকঝকে বরণা। চলো ঠাকুর ফাঁকা মাঠে যাই।

বিশাল প্রান্তরে একটি গাছ। দূরে দূরে ফসলের মাঠ সবুজের সমুদ্র। চিনু কাপড়ের আড়ালে মালা আর মিষ্টান্ন লুকিয়ে রেখেছেন। শূন্যপ্রান্তর। বিশাল গাছটির তলায় তাঁর গদাধরকে আসন করে উপবেশন করালেন। নিজে বসলেন সামনে জানু পেতে। প্রথমে মালাটি পরালেন। তারপর স্বহস্তে গদাধরকে মিষ্টান্ন সেবা করাতে লাগলেন একটু একটু করে। চিনু ভাবে বিভোর। দুচোখে অবিরল ধারা। হাত কখনো গদাধরের ঠোঁটে, কখনো চোখে, কখনো নাকে, কখনো কণ্ঠে। গদাধর নির্বিকার। উপভোগ করছে। গদাধরের চিনুদাদা আজ মহাভাবে বিভোর। শক্তসমর্থ মানুষ। পরিশ্রমী মানুষ। বয়েসের ভারে নুয়ে পড়েননি। ভাগবতে সুপণ্ডিত। মাঝে মাঝে গদাধরের সঙ্গে মতের অমিলে তুমুল তর্ক বিতর্ক। আর তোমার মুখদর্শন করব না। চিনু ঘরে অদৃশ্য হলেন। সে কতক্ষণ! পরমুহূর্তেই ভাব। গদাধরকে কাঁধে তুলে তুমুল নৃত্য।

আজ এমন ভাব যে গদাধরকে হাত ধরতে হয়েছে যাতে হাতটা ঠিক ঠিক মুখে পৌঁছয়। গদাধরকে সেবা করাবার পর চিনু শান্ত হলেন। হাত জোড় করে নতমস্তকে বললেন, 'আগত হয়েছে কাল জরাযুক্ত তনু / কত হবে লীলা-খেলা দেখিতে না পেনু // বড়ই রহিল দুঃখ আমার অন্তরে / করুণ কটাক্ষে রেখ অধীন কিঙ্করে //'.

চিনুশাঁখারী এই নামটিও কাল থেকে কালান্তরে যাবে চরিত্রের স্তবকে। পণ্ডিতরাও সেদিন থমকে গেলেন। লাহাবাবুদের বাড়িতে সেদিন শ্রাদ্ধ। ধনী মানুষ। পণ্ডিতসভার আয়োজন করেছেন। দূর দূরান্তরের টোলের পণ্ডিতরা ছাত্রদের নিয়ে এসেছেন। বিরাট সমাবেশ। যথাসময়ে শুরু হল শাস্ত্রবিচার। তর্ক থেকে মহাতর্ক। শেষে বিতণ্ডা। শেষে তাণ্ডব। মাঠ ময়দান থেকে ছুটে এসেছেন উৎসুক নরনারী। গদাধরও ছুটে এসেছেন, পণ্ডিতদের মধ্যে এত কলহ কি কারণে!

বালক গদাধরের তখন এমন রূপ চোখ ফেরানো যায় না। মাথায় বড় বড় চুল। চন্দ্রাদেবী মেয়েদের মতো বেণী করে দিতেন। আজানু লম্বিত বাহু। গদাধর যেখানে সেখানে যেন চন্দ্রোদয়।

গদাধর পণ্ডিতসভায় প্রবেশ করল। সবাই ভাবলেন কৌতূহলী বালক। কেউ তেমন গুরুত্ব দিলেন না। হঠাৎ গদাধর বলে বসল, কি কারণে এত বিবাদ। সহজ সমাধান ত এই। গদাধর হাসছে। পণ্ডিতকূল হতভম্ব। এতক্ষণের বাকবিতণ্ডা বালকের এক কথায় শেষ। কে এই বালক! জনমণ্ডলী তখন সমস্বরে বালকের জয়ধ্বনি দিচ্ছেন।

কলকাতা এখনো এক যুগ দূরে। সেখানকার জল আরও একটু ঘোলা হোক। মানুষ আরো দিশাহারা হক।

শুধু চিনু কেন! পিতা ক্ষুদিরামেরও ত কিছুই দেখা হবে না। যে-অনন্ত গয়াধামে ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, আমি তোমার কাছে একটি দেহ-ঘট চাইছি ব্রাহ্মণ সসীমে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে। আমার কিছু কাজ আছে তোমাদের ওই পৃথিবীতে, সেই অসীমই খুলে দিলেন সীমার বন্ধন।

১৮৪২ সাল। দুর্গাপূজা এসে গেছে। প্রকৃতিতে সাজ সাজ ব্যস্ততা। আকাশ বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়ে নীলিমায় নীল। সরোবরে শিশির ধোয়া পদ্মদল। ভোরে শীত শীত বাতাসে নতুন নতুন পাখিদের ডাক। দিবসে ঝলসান রোদ। মাঠেমাঠে বালকদের উল্লাস। পুজো এসেছে পুজো। কুমোর পাড়ায় যাঁর পূজা তিনি দশভূজা মূর্তি ধারণ করছেন। বালক গদাধরের কি আনন্দ! চন্দ্রমণির একটাই ভয়, এই আনন্দ গদাধরের ভেতরে প্রবেশ করলেই ভাব, আর ভাব হলেই সংজ্ঞাহারা। সে যে কোনো জায়গায় হতে পারে, যে কোনো অবস্থায়। মাঠে, গ্রামের পথে, জলের ধারে।

রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুদিরামের কৃতী ভাগনে। বোন রামশীলার বড় ছেলে। কামারপুকুরের ছ ক্রোশ পশ্চিমে ছিলিমপুর। ছিলিমপুরের ভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সঙ্গে বিবাহ হয়। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। মেয়ের নাম হেমাঙ্গিনী। রামচাঁদ মেদিনীপুরে মোক্তারি পেশায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। যথেষ্ট উপার্জন। প্রতিবার তিনি সাড়ম্বরে দুর্গা পূজা করেন সিলিমপুরের পৈতৃক বাড়িতে। বিশাল আয়োজন। পুজোর কটাদিন দিবারাত্র স্তোত্র পাঠ, গীত বাদ্য। ব্রাহ্মণভোজন, পণ্ডিতবিদায়, দরিদ্রভোজন, বস্ত্রদান, আনন্দের মহাহিল্লোল, সে এক এলাহি ব্যাপার।

রামচাঁদ প্রতি বছরই এই মহাপূজায় তাঁর শ্রদ্ধাস্পদ মাতুলকে সাদরে সিলিমপুরে নিয়ে যেতেন। কটি দিন ক্ষুদিরাম মহানন্দে অতিবাহিত করতেন।

এবারের পূজাতেও সেই একই আমন্ত্রণ। শরীর খুবই অপটু। সেই কবে পৃথিবীতে এসেছেন! কত সংগ্রাম! জীবনের উত্থান পতন! কত গেল, কত এল! যৌবনে প্রায় পদব্রজে কত তীর্থভ্রমণ! সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত যাওয়া গিয়েছিল দুটি পায়ের জোরে। একটি বছর সময় লেগেছিল দাক্ষিণাত্যের প্রায় সমস্ত পুণ্যতীর্থ দর্শনে। সেই শরীর আর এই শরীর! এটা কত সাল? দেখতে দেখতে ১৮৪২ও শেষ হতে চলল। এই ত শরৎ! শীত পেরলেই নতুন বছর! তাহলে বয়স কত হল? আটষট্টি!

বয়সের শরীরে রোগের উৎপাত। বাঙলার সমস্যা ত জল! যৌবনের শক্তি ও শ্রমে অজীর্ণ আর উদরাময়কে বাগে রাখা যায়। পরে ওই উৎপাতই দুর্বলকে পেড়ে ফেলে। শরীর এত দুর্বল দুর্গাপুজোয় যাবেন কি-না ভাবছেন। হঠাৎ মনে হল, কে বলতে পারে এই পূজাই জীবনের শেষ দর্শন কি-না! তা হলে ঘুরে আসি! ভেবেছিলেন গদাধরকে নিয়ে যাবেন। এখন এমন হয়েছে, তাকে ছেড়ে এক দণ্ডও থাকতে পারেন না। তারপরে মনে হল এই শরীরে গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে গেলে চন্দ্রাকে ভীষণ উদ্বিগ্ন থাকতে হবে।

বড় ছেলে রামকুমারকে সঙ্গে নিলেন। রঘুবীরকে প্রণাম করলেন। অনুমতি চাইলেন, তাহলে কয়েকদিনের জন্যে আমি আসি রঘুবীর। অনুমতি করো! এরা রইল তোমার আশ্রয়ে। তুমি দেখো। রঘুবীর কি হাসছেন! বলতে চাইছেন, তুমি আর ফিরবে না ব্রাহ্মণ।

গদাধরের মুখ চুম্বন করে বললেন, আসি রে! রঘুবীরকে দেখিস, মাকে দেখিস। সাবধানে থাকিস। ক্ষুদিরাম একবার সব দেখলেন চারপাশে তাকিয়ে। বন্ধু সুখলালের দান। তুমি ত চলে গেছ বন্ধু! সুক্ষ্মে দেখ, ক্ষুদিরামের সংসার কেমন সেজে উঠেছে! তোমারই দেওয়া লক্ষ্মীজলার বিঘেখানেক জমির ধানে সারা বছর হেসে খেলে চলে যায়। ওই দেখ, গদাধরের স্থাপন করা আমগাছটি কেমন বাড়ছে!

চন্দ্রা! আমি তাহলে আসি! এই ত কটা দিন! তোমরা গ্রামের পূজায় আনন্দ করো। দুর্বল শরীরে যাত্রাপথের দিকে এগোলেন বৃদ্ধ ক্ষুদিরাম। দুর্বল পায়ের তলায় কামারপুকুরের পথ। শরতের শোভায় সজ্জিত শিশির সিক্ত প্রকৃতি। ওই সেই প্রান্তর, বৃক্ষাদি, শ্মশান। ওই সেই লাহাবাবুদের গৃহ, চণ্ডীমণ্ডপ, পাঠশালা, পাইনদের বাড়ি, চিনু শাঁখারীর দোকান। ওই ত ধনীর চালা। কে যায়? প্রসন্ন বুঝি।

জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমারের কাঁধে হাত রেখে ক্ষুদিরাম পথ অতিক্রম করছেন। দেবীর বোধন শুরু হয়ে গেছে। বহু দূরে হতে প্রান্ত পেরিয়ে ভেসে আসছে ঢাকের শব্দ। সানাই এইবার বাজবে। ধীর পা দুটি যত সামনে এগোয়, পথ ততই পেছনে সরে। পথের দুপাশে শোভা ধরে আছে টগর। শিউলির অঞ্জলি শুরু হয়ে গেছে। পদ্ম তাকিয়ে আছে সূর্যের দিকে অপলকে। হালদারপুকুরের জল শীতল হয়েছে। শীত লেগেছে। দূরে, দূরে আরও দূরে স্বচ্ছ বাষ্প মায়াবিনীর আঁচল উড়িয়ে রোদের প্রতীক্ষায়। এ সবই গদাধরের স্বাধীন বিচরণ ভূমি।

ধর্মদাস ধনী হলেও বন্ধু। পথে দেখা হতেই বললেন, 'যাও ঘুরে এসো। তোমার প্রিয় জায়গা। এখনও পারছ, পরে আর পারবে না। শরীর ভাঙছে।' ক্ষুদিরাম হাসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এ বছর কি পালা দিচ্ছ?' ধর্মদাস বললেন, 'প্রহ্লাদ চরিত্র। বাঁকুড়ার দল। খুব ভাল। তাড়াতাড়ি চলে এস তুমি। পুজোর সময় তোমার মতো মানুষ গ্রামে না থাকলে চলে।'

ক্ষুদিরাম বললেন, 'আমাদের গ্রামেই ত তিন দল যাত্রা আছে।'

ধর্মদাস বললেন, 'তাদের আর পেলুম কই? তোমার ভাগনেই ত সেই তিন দলকে বায়না করেছে এবার। বাউলের দলও তো যাচ্ছে ওখানে। গ্রামের কবির দলকে পেয়েছি। দেখি ওরা এইবার কি করে।'

ক্ষুদিরাম এগিয়ে গেলেন। পথের ধারে লাহাবাবুদের পান্থধাম। তিনজন বিহারী সাধু বিশ্রাম করছেন। একজন 'রামচরিত মানস' পড়ছেন। অন্য দুজন শুনছেন। ক্ষুদিরাম দূর থেকে তাঁদের নমস্কার করলেন। একসময় তিনিও এইরকম রমতা সাধুদের মতো ভারততীর্থে ভ্রমণ করেছেন। শরীর আজ বয়সের ভারে অপটু।

দূর থেকেই শুনতে পাচ্ছেন ভাগনের বাড়িতে ধুমধামের কলকোলাহল। ক্ষুদিরাম আসতে পেরেছেন। রামচাঁদের খুব আনন্দ! কৈলাস থেকে মা এসে প্রথমেই খবর নেবেন, কামারপুকুর থেকে গদাধরের বাবা ক্ষুদিরাম কি এসেছে?

ষষ্ঠী গেল, সপ্তমী বিদায় নিল। উৎসবের বাড়ি। বহু মানুষের সমাগম। আহারাদির গোলোযোগে ক্ষুদিরামের উদরাময় প্রবল হল। তা হক, ক্ষুদিরাম

সামলে নিচ্ছেন। উৎসবের আনন্দ অনুষ্ঠানে যেন কোনও ব্যাঘাত না ঘটে। অষ্টমীর পূজাও সমাপ্ত হল। নবমীর সকাল থেকে শরীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। শয্যাশায়ী ক্ষুদিরাম ধীরে ধীরে একটা ঘোরের মধ্যে চলে যাচ্ছেন। ভাগনে রামচাঁদ, ভাগনী হেমাঙ্গিনী পুত্র রামকুমার সযত্নে সেবা করে চলেছেন। এল দশমী। বিজয়াদশমীর অপরাহ্নে প্রতিমা নিরঞ্জন হয়ে গেল। রামচাঁদ তাড়াতাড়ি চলে এলেন মামার কাছে। সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন। সাড়াশব্দ নেই। নড়াচড়া নেই। রামচাঁদ কাঁদছেন আর বলছেন, 'মামা, তুমি যে সবসময় রঘুবীর, রঘুবীর বলো, এখন বলচ না কেন?'

রঘুবীরের নাম কানে যাওয়া মাত্রই ক্ষুদিরামের চৈতন্য এল। তিনি খুব আস্তে, জড়ান গলায় বললেন, 'কে রামচাঁদ? প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেল? তবে আমাকে একবার বসিয়ে দাও।' খুব সাবধানে, ধরে ধরে তাঁকে বিছানায় বসিয়ে দেওয়া হল। গম্ভীর কণ্ঠে তিনবার বললেন — রঘুবীর। ক্ষুদিরামও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন মাকে অনুসরণ করে।

পরের দিন কামারপুকুরে খবর এল — ক্ষুদিরাম আর ফিরবেন না। সব আনন্দ এক ফুঁয়ে ম্লান। গদাধরের বয়েস মাত্র সাত। আঘাত যে কত গভীর কে বুঝবে? বিষণ্ণ হওয়া ত চলবে না। মা যে তা হলে আরও ভেঙে পড়বেন। গদাধরের কাজ ত মানুষকে আনন্দ দেওয়া। অস্তিত্বে বিশ্বাস দেওয়া। ধুনুরির টঙ্কার মারা ধনুকের তাঁত থেকে ছিটকে পড়া তুলোর মতো জীবনযন্ত্রণা সব উড়িয়ে দেওয়া, নির্ভরতা দেওয়া। মায়ের জন্যে গদাধরকে আরো চনমনে হতে হবে। আরো গান গাইতে হবে। অভিনয় করতে হবে। হাসতে হবে, হাসাতে হবে।

গদাধর মায়ের কাছে কাছে, পাশে পাশে থাকে। ঘরের কাজে সাহায্য করে। দেবসেবার আয়োজন অনেকটাই করে দেয়। দাদা পূজায় বসবেন। আর নিস্তব্ধ দুপুরে সবার অলক্ষে পিতাকে খুঁজে পায় রেখে যাওয়া স্মৃতিতে।

এই যে রঘুবীরের ঘরে দেবতাদের বেদী, বাবা একদিন দুপুরবেলায় নিজে মাথায় করে মাটি এনে নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। মায়ের কাছে সেই বর্ণনা গদাধর শুনেছে। এখন সেই অতীত চোখের সামনে ছবি হয়ে উঠছে। চিরকালের ভক্ত ব্রাহ্মণ এই ভাবেই বেদী রচনা করবেন তাঁর ইষ্টের জন্যে। এই বেদীটি হল শাশ্বত ভক্তির প্রতীক। এই যে শ্বেত পাথরের রামেশ্বর

শিব পিতা এনেছিলেন রামেশ্বর তীর্থ থেকে। সেবার পুরো একটি বছর তীর্থ পরিক্রমা করেছিলেন। এই যে আম্রপল্লব সমন্বিত সিন্দুরচর্চিত ঘট, ইনি আদি গৃহদেবতা মা শীতলতার প্রতীক। ক্ষুদিরাম দর্শন করেছিলেন, মহামায়া শীতলা মূর্তিতে, সে রূপটি কেমন — বালিকা, সিঁদূরে রঙের শাড়ি পরেছেন, হাতে একটি ঝাঁটা, সব অমঙ্গল আবর্জনা ঝেঁটিয়ে বিদায় করছেন। কাঁখের কলসীতে অমৃতবারি। পল্লব দিয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে সকল প্রাণীকে শান্তি দিচ্ছেন, শীতল করছেন। সেই মহামায়াই একরূপে শীতলা। সিঁদুর মাখানো শান্তিজলের ঘটটি বাবার স্বহস্ত-নির্মিত বেদীতে স্থাপিত। বিশেষ, বিশেষ দিনে জল পরিবর্তন করা হয়। রঘুবীরকে নিবেদন করা হয় নিরামিষ ভোগ। রঘুবীর রামচন্দ্র ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের, তাই ক্ষুদিরাম মাঝে মাঝে খিচুড়ি ভোগ দিতেন। মা শীতলাকে দেওয়া হয় মাছভোগ।

মাকে নিদ্রিতা দেখে গদাধর পিতার স্মৃতিপরিক্রমায় বেরলেন। এই ত আমার তীর্থভ্রমণ! সুখলাল গোস্বামীর 'গোঁসাই মহল'। মহাদুর্দিনে পিতার আশ্রয়দাতা। অদ্ভুত ভাল লাগে এই মহলটি। যেন একটি কাছারি বাড়ি। ইটের পাঁচিল ঘেরা একটি পাকা কোঠা। দক্ষিণে মহলের প্রবেশ দ্বার। পাশেই একটি পুকুর। পুকুরের ধারে ছোট্ট একটি স্তূপের মতো গাঁথনি। গদাধর সেইটির সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। পাইন পরিবারের কোনো বধূ সতী হয়েছিলেন। এটি তাঁরই স্মৃতি।

এরপরেই লাহাবাবুদের অতিথিশালা। পুরীর পথে কত সাধু, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, এখানে বিশ্রাম করে আবার চলতে থাকেন। চলাই তাঁদের কাজ। রমতা সাধু, বহতা পানি।

বাবা নেই। কোথাও নেই। গ্রামের ঠিক মাঝখানে বিশাল এই জলাশয়। এরই নাম কামারপুকুর। দক্ষিণ-পশ্চিমতীরে কর্মকারদের পাড়া। ওই ত গদাধরের ধাত্রীমাতা ধনীর বাড়ি। গদাধর কত কি ভাবে। কত কৌতূহল! ধনী মাতা কেমন করে শিখল পৃথিবীতে মানুষ আনার কৌশল!

ওই সেই হালদারপুকুর। বাবা রোজ স্নান করতেন। গ্রামের মানুষ তাঁকে কত সম্মানই না করতেন। যতক্ষণ তিনি স্নানে থাকতেন পুকুরে কেউ নামতেন না। হালদারপুকুরের কাল জলে সাদাসাদা ফুল ভাসছে। সাদা সাদা হাঁস।

দাদা একদিন ডেকে বললেন, 'সংসার। গদাধর বাবা চলে গেলেন। তোর কথা ত আমাকে ভাবতে হচ্ছে! এই সংসারে কে কাকে দেখে! নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলে যে লেখাপড়া শিখতে হবে। ব্রাহ্মণের ছেলে!'

গদাধর বললেন, 'তাহলে কাল থেকে পাঠশালে যাই! দাদা! পাঠশালে?'

রামকুমার খুশি হলেন। যাক, উদাসী বাউল এব্যার রাজি হয়েছে। এই পরিবারের ছেলে, নিরক্ষর হয়ে থাকলে চলে! দাদাকে বললেন বটে, পাঠশালা কিন্তু বিরক্তিকর মনে হল। পণ্ডিতমশাই কি শেখাতে চান! ও জ্ঞানে আমার কি হবে! আমি কি মুদির দোকানে হিসেবের খাতা লিখব! আমি কি ময়রার দোকান করব! দাদা! কথা দিয়েছিলুম, হল না। পারা গেল না পাঠশালায়। আমি বন্ধনের মধ্যে থাকতে পারি না। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও, আমি সব হিসেবের বাইরে।

কলকাতা এখনো দশ বছর দূরে।

জয়রামবাটী এখনও আঠার বছর দূরে।

ইঁটের টোপর মাথায় পরা শহর কলিকাতা
অটল হয়ে বসে আছে ইঁটের আসন পাতা।

It was identified by our mariners with Golgatha, the place of skulls.

ফিলজফার-বিজ্ঞলোক, প্লৌম্যান-চাষা।
পমকিন-লাউকুমড়ো, কুকুম্বার-শশা।।

ভারত অবশেষে ইংরেজের জমিদারি হল। এই যুদ্ধ, সেই যুদ্ধ। বাপ খুন, ছেলে খুন। মুকুটধারী একটা লোক, তার তিন হাজার বউ। এদের দ্বারা কিছু কি করা সম্ভব! তৈমুরের বংশধরেরা সেই বাবরের মূর্তিতে ভারতে হাজির হওয়ার পর থেকে উত্তর ভারতে কি যে হতে লাগল — সময় থেকে অনেকটা দূরে সরে এসে ইতিহাসের দূরবীনে দেখলে হাসি পাবে।

এত বড় একটা দেশ! কাঁচা হাতে বেলা একটি পরোটার মতো লবণসমুদ্রে ভাসছে। তিনদিকে সমুদ্র। মাথার ওপর দুর্ভেদ্য পাহাড়। সেই পাহাড় ভেদ করে কান্দাহারের পথে অস্ত্রধারী, সাহসী, ভাগ্যান্বেষী যুদ্ধবাজদের ভারত

প্রবেশ কে আটকাবে। তুর্কিদের ঘোড়া পথ যত দুর্গম হবে ততই তাদের শক্তি বাড়বে।

প্রথমে আর্য, তারপর পার্সি, তারপর আলেকজাণ্ডার, তারপর মুসলিম মোগল। মোগলরা বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলেন। সমস্যা একটাই মোগল নীতি হল, 'রাজার কোনো বন্ধু নেই'। আওরঙ্গজেব বললেন, 'নিজের ছায়াকেও বিশ্বাস করবে না।'' এই করতে গিয়ে যা হল, ছেলে বাপকে কোতল করে ত, বাপ ছেলেকে। এদিকে সমুদ্র পথ খুলে গেল, আর পাহাড় ফুঁড়ে আসার দরকার রইল না। পশ্চিমের উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রলম্বিত তটভাগে ইওরোপের জাহাজ ভিড়তে লাগল। শুরু হল সিংহাসনের লড়াই নয় বাণিজ্যের লড়াই। ইংরেজ বাণিজ্যকে সামনে রেখে শাসনের বাসনা অব্যক্ত রেখেছিল। ঝোপ বুঝে কোপ। মোগলরা ঘোড়া বুঝত। জাহাজ তেমন বুঝত না। সমুদ্র সম্পর্কে উদাসীন। একটা ব্যাপারে তাদের সামান্য মাথা ব্যথা ছিল, মুসলিম তীর্থযাত্রী। সুরাট থেকে হজযাত্রীদের জাহাজ ছাড়ত। সমুদ্রে পড়ামাত্রই পর্তুগীজদের উৎপাত। ইংরেজরা বাণিজ্যের চুক্তিতে যাত্রীজাহাজকে সুরক্ষা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে পশ্চিম ভারতে ক্ষমতা বিস্তার করল প্রথমে। তারপর?

তারপর বঙ্গদেশ ত আছে। পলাশী থেকে ঠেলে উঠল ওপরে। ভারতবর্ষ পেয়ে গেল ইংরেজ ছলে বলে কৌশলে। ঐতিহাসিকরা বললেন ভালই হল। মোগল, পাঠান সব ল্যাজে গোবরে হচ্ছিল। সাধারণ মানুষ জর্জরিত হচ্ছিল। বৃটিশ ল, বৃটিশ অ্যাডমিনস্ট্রেসান এক আলাদা জিনিস। বিজ্ঞান আসছে, যন্ত্র আসছে, পার্লামেন্ট আসছে, পশ্চিম আজ খুলিয়াছে দ্বার। এই ত ছিল ছিরি আমাদের জন জীবনের। আমরাই লিখে রেখেছি আমাদের কথা,

রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হইএগ।
রাত্রদিন কৃড়া করেক পরস্ত্রী লইয়া॥
শ্রীঙ্গার কৌতুকে জীব থাকে সর্বক্ষণ।
হেন নাহি জানে সেই কি হবে কখন॥
পরহিংসা পরনিন্দা করে রাত্রদিনে।
এই সকল কথা বিনে অন্য নাহি মনে॥

মানুষ আছে কিন্তু মানুষ নেই। দিনের বেলা লণ্ঠন হাতে বেরিয়েছেন

মুকুন্দ দাস। মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি স্বভাব কবির। প্রশ্ন করা হল, উত্তর দিলেন, মানুষ খুঁজতে বেরিয়েছি। আমবাগানের যুদ্ধে ক্লাইভ একটা ঝুঁকি নিয়েছিলেন, নবাবের হাতে হেরে ভূত হওয়ারই কথা। ঐতিহাসিকের উক্তি, 'পলাশীর যুদ্ধ উহা যুদ্ধ নহে, দৈবের খেলা। যাঁহারা বিলাসী, অত্যাচারী, স্বেচ্ছাতন্ত্রী এবং অলস তাঁহাদের হাত হইতে ভগবান ঐশ্বর্যলক্ষ্মীর প্রকৃত সেবক, স্বার্থবিস্মৃত, জাতীয় স্বার্থসর্বস্ব, গিরি-সাগরলঙ্ঘী, অদম্য-উৎসাহশীল, নবগঠিত, নব তেজোদৃপ্ত একটি জাতির হাতে এই বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করিলেন, পলাশী উপলক্ষমাত্র। উহা রাজলক্ষ্মীর কৌটা — একটা ময়দানে বসিয়া যুদ্ধের ছলে ভাগ্যলক্ষ্মী তাহা তাঁহার যোগ্য সন্তানদিগকে দিলেন। মীরজাফর আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা দিকের প্রতীক। শকুনি, জয়চন্দ্র, মীরজাফর প্রভৃতি ব্যক্তির যুগে যুগে অভ্যুদয় হইয়াছে — ভারতবর্ষ যে এখনও স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য হয় নাই,তাহা প্রমাণ করিতে। আমাদের রক্তের মধ্যেই মীরজাফর ও জয়চন্দ্র রহিয়াছে — উহা বহুদিনের ব্যাধি।'

গদাধর সংজ্ঞা হারালো। মাঠের পথে বয়স্যদের সঙ্গে যাচ্ছিলেন। কোঁচরে মুড়ি। মুঠোমুঠো মুখে পুরছিলেন। আকাশের ঈশান কোণে ঘন কালো ঝড়ের মেঘ। মালার মতো এক সার সাদা বক উড়ে চলেছে। বালকের অন্তরের আকাশ খুলে গেল। দেখতে পেল সুন্দরের প্রকাশ। ভেতর আর বাইরে এক হল। সসীম, অসীম এক হওয়া মাত্রই তিনি পড়ে গেলেন, সংজ্ঞাহারা।

সাদা আর কালো, ধনী আর দরিদ্র। উচ্চ বর্ণ আর নিম্ন বর্ণ, শাক্ত আর বৈষ্ণব, হিন্দু আর মুসলমান, জ্ঞান আর অজ্ঞান, বিষয় আর নির্বিষয়, যে কোনো নীচ দ্বন্দ্বের আঘাতে গদাধরকে এরপরে বারে বারে সংজ্ঞাহারা হতে হবে দুঃখে, তারপর অদ্ভুত এক তেজে এমন আঘাত হানবেন অনড় সমাজের সমাজপতিদের, যে সব অচলায়তন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

একটি ছবি, সুন্দর একটি মসৃণ ছবি যন্ত্র দিয়ে দেখলে, দেখা যাবে অসংখ্য বিন্দুর সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে জমি। দর্শন আর দৃশ্য হল অসংখ্য দৃশ্যবিন্দুর ঘনসন্নধ্য অবস্থান। মহাকালের ত ছবি তোলা যায় না। অদৃশ্য অথচ অবস্থিত আবার এক মহাযোনি, ব্রহ্মযোনি, যেখানে ঘটনা সম্বলিত অনন্ত মুহূর্তের জন্ম আর মৃত্যু, বিকাশ আর লয়। চর্বিত ছিবড়েই ইতিহাসের সূচিপত্র।

কালের ধ্বংসস্তূপে গদাধর। ইঁট নয়, গাঁথনির মশলা নিয়ে উপস্থিত হলেন বুঝি এক অলৌকিক কারিগর। গাঁথনি শুরু করার দেরি আছে এখনো, এখনো আঠার বছর। এই ত সবে সাত। বিশাল এক কাষ্ঠখণ্ড মহাসমুদ্রে ভাসছে। এদিকে ভার পড়লে ওদিকটা উঠবে। শ্রীকৃষ্ণের পাদভারে কালসমুদ্রে ঠেলে উঠল কলি। সেইরকম কলি, ঘোর কলি, কালী। গদাধরকে ক্ষুদিরাম চিনতেন। চেনাটা ঠিক হয়েছিল কি-না, না জেনেই কালের স্রোতে পুত্র হতে বিচ্ছিন্ন অতীত। কুঁড়ি বাঁধা থাকে সময়ের বাঁধনে। উলট পাকে যতক্ষণ না খুলছে ততক্ষণ ফুল কোথায়, ভ্রমর কোথায়, বিস্ময় কোথায়!

এ কেমন ফুল। সময়ের পাকে বাঁধা! না ফুটলে বোঝা যাবে কি — এই ব্রহ্মকমল! পরাগ ছড়াবে কতদূর! রেণু রেণু চারিয়ে যাবে জীব গোষ্ঠীতে। কাল-সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়বে জীবনতটে।

ধর্ম একটা চিরকালের অশান্তির জিনিস। ঈশ্বর মাঝে মাঝে নিজেই অবাক হয়ে যান। মন্দিরে মসজিদে গির্জায় মানুষ কার উপাসনা করে বলত নারদ? নারদও উত্তর দিতে পারেন নি। সব বিজেতারই এক ধারা। রাজ্যপাট গুছিয়ে বসার পরই পুরোহিত গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁরা বলতে থাকেন প্রজাদের এইবার ধর্ম দিয়ে উদ্ধার করতে হবে। সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মুসলমান আক্রমণকারীরা সিদ্ধান্ত নিলেন ভারতে আর হিন্দু থাকবে না। বৌদ্ধ জৈন মঠ মন্দির ও বিহার তোপ মেরে উড়িয়ে দাও। পৌত্তলিকতা বরবাদ করে আল্লার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা কর। লাগাও ধুন্ধুমার! মহম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু প্রদেশে দেবলবন্দর আক্রমণ করে সেখানকার যত পুরুষ, তাদের শেষ করে দিলেন। তারপর মনে হল সবই যদি মরে গেল তাহলে আল্লাকে ভজবে কে! হানাফী-ফিক্ অনুযায়ী খৃষ্টান ইহুদি ও হিন্দুদের অধম নাগরিক 'জিম্মী' বানান হতে লাগল। জিম্মীদের ওপর বসিয়ে দেওয়া হল জিজিয়াকর। সরাসরি হত্যা না করে ভাতে মেরে হত্যার পরিকল্পনা। মুসলমানরা যোদ্ধা আর হিন্দুরা যুদ্ধে ওস্তাদ নয়। ফলে তারা পালাতে লাগল। শামুকের মতো নিজেদের গুটিয়ে নিতে লাগল। হিন্দুদের নীতিটা হল গ্রাম তছনছ হয়ে যাওয়ার পরিণতি থেকে রক্ষা দেওয়ার উপায় হল গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া। হিন্দুরা ক্রমশই কোণঠাসা। মুসলিম আক্রমণের আগে ভারত একতাবদ্ধ ছিল না। রাজনৈতিক একতা না থাকলেও সাংস্কৃতিক ঐক্য ছিল। বৌদ্ধ জৈন ও সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ধর্মের ভিত্তিতে পরস্পর

একই ছিল। রাজায় রাজায় যুদ্ধ ছিল। সেই যুদ্ধের পরিণতি ছিল বশ্যতা স্বীকার। আর মুসলমানরা ছিল লুঠেরা। তাদের সৈন্যবাহিনীকে বলাই ছিল যুদ্ধ জয়ের পর লুঠপাট করবে আশি ভাগ তোমরা নেবে আর কুড়ি ভাগ দেবে রাজাকে। এই লুঠের মালের মধ্যে বিধর্মীদের স্ত্রীকন্যাও তোমাদের। বিয়ে না করেও নির্বিচারে ভোগ করবে। পৌত্তলিকদের সঙ্গে যুদ্ধে জিতলে তোমাদের বলা হবে গাজী। আর যদি মরে যাও তাহলে ত তুমি শহীদ। বেহস্তের জমিদারি তোমার বাঁধা।

বিজয়নগরের যুবরানী গঙ্গাদেবী 'মধুরা বিজয়ম্' নামে একটি মহাকাব্য লেখেন। কবি দুঃখ করে লিখছেন — 'ওই দুষ্ট ম্লেচ্ছের দল হিন্দু ধর্মের ওপর নিত্য নিত্য নতুন কায়দায় অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। দুঃসহ সে অভিজ্ঞতা দেবপ্রতিমা ভেঙে চুরমার করছে, পুজাপাত্রগুলি বাইরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। ওরা শ্রীমদ্ভাগবৎ ও অন্যান্য ধর্ম পুস্তক আগুনে ফেলে পুড়িয়ে দিচ্ছে। ব্রাহ্মণের দেহের চন্দন লেপ চেটে চেটে উঠিয়ে দিচ্ছে। কুকুরের মতো তুলসি গাছে প্রস্রাব করছে। মন্দিরের ভেতরে ঢুকে মলত্যাগ করাটা অতি সাধারণ ব্যাপার। যেন ওইটিই তাদের শৌচাগার। পুজারি ব্রাহ্মণের গায়ে কুলকুচো করছে। হিন্দু সাধুসন্তরা এদের সন্ত্রাসে প্রায় আধমরা। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় ওরা কি সব পাগলা গারদ থেকে বেরিয়ে এসেছে!'

বৈদিক হিন্দুরা আদিবাসী ধর্মসংস্কৃতির সঙ্গে একটা সুন্দর সুস্থ মিলনের আদান-প্রদানে ধর্মের পরিসর বাড়িয়ে ছিলেন। তারা কখনও বলেন নি তোমাদের ধর্মসংস্কৃতি নিকৃষ্ট। অখণ্ড ভারতধর্ম এইভাবেই তৈরি হত। মুসলমানরা এসে সব শেষ করে দিল। ইসলামের ধর্মে গ্রহণ নেই, পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে এই গ্রহণের দিকটি ছিল অসীম। তাঁরা সব ধর্ম থেকেই গ্রহণ করতে পারতেন। সুলতানি আমলে বাংলাদেশে এক অসাধারণ ধর্মসংস্কারক সমাজসংস্কারক এসেছিলেন। তাঁর নাম শ্রীনিমাই। হুসেন শাহী বাংলা থেকে তিনি তাঁর লীলাক্ষেত্র উড়িষ্যায় সরিয়ে নিয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে তিনি রহস্যজনক ভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একটা শূন্যতা তৈরি হল। হিন্দুরা তাঁদের সনাতন ধর্মের মূলতত্ত্ব ভুলে গিয়ে বেদবেদান্তের চর্চা উঠিয়ে দিলেন। ধর্ম তখন হয়ে দাঁড়াল স্মৃতি ও ন্যায়ের চর্চা। স্মৃতি হল আচার-আচরণের শাস্ত্র। সনাতন ধর্মের শাশ্বত সত্য চলে গেল অন্তরালে। আচার-আচরণ তো শাশ্বত নয়, সেইটাতেই শাশ্বত করে তুললে হিন্দু ধর্মের পরিণতি

যা হওয়ার তাই হয়েছিল। পুরোহিতদের ফরমান ও নানা কুসংস্কারই সংস্কার হয়ে দাঁড়াল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সমাজে আচার-আচরণই হল হিন্দুর ধর্ম। হিন্দু ধর্মের উদার অপূর্ব দিক অনুপস্থিত। এদিকে তন্ত্র ও বৈষ্ণব ধর্ম হয়ে দাঁড়াল বিচিত্র ব্যাভিচার। ব্রাহ্মণ সমাজের স্তরবিন্যাস অসংস্কৃতই রয়ে গেল। তার ফলে এল কুলীনের বহুবিবাহ এল শিশুহত্যা পতিতাবৃত্তি আর উত্তর পশ্চিম ভারতের সহমরণ প্রথাটিও মহাসমারোহে বঙ্গে প্রবেশ করল। স্মৃতি শাস্ত্রকারদের লিপি প্রমাদেই এই কাণ্ডটি ঘটেছিল।

পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানির কলকাতায় একদল দিশি বড়লোক ও জমিদারের আবির্ভাব হল। ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসা করে আর সুদে টাকা খাটিয়ে তৈরি হল একদল ধনী মাতব্বর। ধনীদের যা ছিরি, 'ব্যাভিচারী ভন্ড অসংবৃত অনাচার সর্বস্ব।' বঙ্গ সমাজের জীবনচিত্র তখন অতি অপূর্ব। চড়কের সময়ে হৈ হৈ করে আগুন-ঝাঁপ, কাঁটা-ঝাঁপ, বাণ-ফোঁড় কদর্য সঙ সাজা। দুর্গাপুজোর সময়ে মায়ের পুজো মাথায় থাক নিয়ে এস মদ, ধরে আন বাইজি। মাকে চাপাও কাটলেটের ভোগ আর সায়েবসুবোদের ডেকে এনে তেলবাজি কর। রাসযাত্রা মানে পরস্ত্রী সম্ভোগ। মাহেশে স্নানযাত্রার সময়ে মেয়েমানুষ নিয়ে গিয়ে হুল্লোড় কর। যুবতী স্ত্রীকে বাঁধা রেখে জুয়া খেল। আর শাক্তদের তন্ত্রের নামে বিকৃত বামাচার আর কবির লড়াই হল রাধাকৃষ্ণের নামে খিস্তি খেউড়।

এখন কথা হল ইংরেজরা আমাদের নষ্ট করলে না ইংরেজরা আমাদের জন্যে নষ্ট হয়ে গেল! বিলেতের নিম্নমানের যুবকরা এখানে কোম্পানির চাকরিতে আসত। তাদের নৈতিক চরিত্র খুব ভাল ছিল এমন বলা যাবে না। তাছাড়া এত বড় একটা সাম্রাজ্যের দখলদার হয়ে অহঙ্কারকে বাগে রাখা সহজ ছিল না। এল ঘোড়দৌড় মদ্যপান জুয়াখেলা। এ শুধু নিচের তলার ইংরেজদের চরিত্র নয়, ওপরতলার ইংরেজরাও এর বাইরে ছিলেন না। কোনও ভদ্রমহিলার বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে তিনি লাটসাহেবের রক্ষিতা হবেন কিনা এই নিয়ে আলোচনা হত। কোনও ইংরেজ ললনা জাহাজ থেকে নামলে শুরু হয়ে যেত দখলের কাজিয়া। ওয়ারেন হেস্টিংস ফিলিপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে ডুয়েল লড়ে গেলেন। কারণ? একজন রমণী! ম্যাডাম গ্র্যান্ড।

ইংরেজ তখনও পর্যন্ত ধর্ম নিয়ে ধস্তাধস্তি করেনি। কিন্তু লন্ডনে কোম্পানির ওপর একটা চাপ সৃষ্টি করা হল — একটা আন্দোলন —

'সু-সমাচার প্রচার।' বৃটিশ পার্লামেন্টকে নড়েচড়ে বসতে হল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেক্টরস-এর সদস্য এবং বৃটিশ পার্লামেন্টের সভ্য চার্লস গ্রান্ট একটা বই লিখে ফেললেন — 'গ্রেট বৃটেনের এশিয়াবাসী প্রজাদের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা এবং উন্নতি ঘটানোর উপায়।' বইটি তিনি কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেক্টরস এবং পার্লামেন্টে পেশ করলেন। প্রস্তাব, ভারতীয়দের পশ্চিমী শিক্ষা-দীক্ষায় সুশিক্ষিত করে আর সেই প্রভাবের জোরে তাদের খৃষ্টান করে ফেলতে হবে। কিন্তু গ্রান্টের এই দাবী কেউ তেমন মেনে নিলেন না। ধর্ম নিয়ে এখনই মাথা ঘামাবার কোনও কারণ নেই। আগে ব্যবসা তারপরে সাম্রাজ্যে আরও ক্ষমতা বিস্তাব। তারপর দেখা যাবে হিন্দু থাকবে না খৃশচান হবে।'

ইতিমধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রবেশের পথ তৈরি করা হয়েছে। ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেছেন। বারাণসীর বৃটিশ রেসিডেন্ট স্থাপন করেছেন বারাণসী সংস্কৃত কলেজ। কেন সংস্কৃত কলেজ? সেখানকার শিক্ষাক্রম তো অবশ্যই ধর্মনির্ভর। ইংরেজদের একটা ব্যাপার ছিল যেটা মুসলিম শাসকদের ছিল না। ইংরেজরা বিজ্ঞানচর্চা করেন। তাঁদের দেশে শ্রেষ্ঠ কবি সাহিত্যিক নটনাট্যকার অনেক। শেক্সপিয়ার মিলটন, বায়রন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা হয়। অপেরা সে দেশেরই জিনিস। তাদের আভিজাত্যের একটা ধরণ আছে। ইংরেজরা সাহসী যোদ্ধা। উদ্ভাবক পর্যটক। তাঁরা পাহাড়ে ওঠেন, তাঁরা সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যেতে ভয় পান না। ইউরোপে তাঁদের প্রভুত্ব অসীম। তাঁরা সংস্কৃত কলেজ খুললেন এই কারণে বিলেত থেকে যেসব সিভিলিয়ান ভারতে আসেন তারা যদি ভারতের ধর্ম কৃষ্টি সংস্কৃতি না জানেন তাহলে ভারতের অন্তঃকরণে প্রবেশ করা যাবে না। ইংরেজ লুঠেরার জাত নয়। ইংরেজ সম্রাটের জাত। ইংরেজদের ভিন্ন ধরনের একটা আভিজাত্য আছে। জীবনের ভাল এবং মন্দ দুটো দিকই জানি। আমাদের অক্সফোর্ড, ইটন, কিংস কলেজ। আমাদের দার্শনিকদের পরা চর্চা। পরা, অপরা দুটি চর্চাতেই আমাদের সমান উৎসাহ। আমাদের সংবাদপত্র। আমাদের থিয়েটারে রাতের পর রাত শেক্সপিয়ারের নাটক। আমাদের অভিনেতা গ্যারিক, সিডান। আমাদের ভাষা।

তবু ধর্ম সব দেশেই একদল যাজক, একদল পুরোহিত তৈরি করে, যাঁরাঅন্ধ, সঙ্কীর্ণ এবং উন্মাদ। যাঁরা ঈশ্বর থেকে আলোক যোজন দূরে।

যাঁরা গোকুলের সন্ধান দিতে গিয়ে গন্ধ গোকুল। তবু ধর্মের সংগঠনের কাছে রাজার যুক্তিবাদ ভেসে যায়। পোপের আদেশে রাজ নির্দেশ নাকচ হয় নিমেষে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনেক আগেই মিশনারীরা সমুদ্রে ভেসে পড়েছিলেন। অজানা ডার্কেস্ট আফ্রিকায় লিভিংস্টোন। স্কটিশ এক্সপ্লোরার। অজানাকে জানার অদম্য বাসনায় হারিয়ে গেলেন। জামবেসি নদীর উৎস খুঁজে পেলেন। ভিক্টোরিয়া ফল্‌সের খবর পাঠালেন সভ্যমানুষের দুনিয়ায়। একটা বিশাল সরোবর এই অন্ধকার অরণ্যময় নরখাদকদের দেশে আকাশের তলায় শোভা বিস্তার করে শুয়ে আছে, তোমরা দেখে যাও, দেখে যাও। লেক নিয়াসা। এরপর তিনি হারিয়ে গেলেন। অভিযাত্রী কিন্তু খৃষ্টের দূত।

১৮২১ সালে 'ব্রাহ্মণ-সেবধির' ভূমিকাতে রাজা রামমোহন লিখছেন, 'ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাহারা মিসনারী নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে তাহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুৎ করিয়া খৃষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতা ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পূর্ণ হয়। দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপন ধর্মের ঔৎকর্ষ ও অন্যের ধর্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন। তৃতীয় প্রকার এই যে কোন লোক যে নিম্নবর্ণের ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনও কারণে খৃষ্টান হয় তাহাদিগে কর্মদান ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে।'

এসে গেছেন কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড, বুকানন, ফরসাইথ প্রমুখ পাদ্রীরা। শুরু হয়ে গেল বিরূপ প্রচার। হিন্দুদের দেবদেবী কদর্য। কেউ খায় মাখন, কেউ খায় ছাগল। কেউ খায় মানুষ। মুণ্ড দিয়ে মালা গেঁথে গলায় ঝোলায়। একজন আবার এক চোখ কানা। সাপ হয়ে ছোবল মারে। ছমাস ঘুমিয়ে কাটায়, ছমাস জেগে থাকে। একজন গলায় সাপের প্যাঁচ মেরে ষাঁড়ের পিঠে চেপে বেড়ায়। শ্মশানে ভূত-প্রেত নিয়ে নাচে। হিন্দুরা আবার মানুষ না কি! সতীত্ব নামক জিনিসটি হিন্দু নারীদের একেবারেই নেই। আমরা তোমাদের উদ্ধার করতে চাই। মানুষ করতে চাই।

আলখাল্লা পরা সাদা পাদ্রীরা প্রায় খেপে গেল। হিন্দু 'হিদেন'-দের উদ্ধার করতেই হবে। সব জন্তু জানোয়ার ছাগল হয়ে আছে। ফোর্ট উইলিয়াম

কলেজ স্থাপিত হল। ইংরেজ অফিসাররা ভারতীয় ভাষা শিখবে, ফার্সী শিখবে, ভারতবর্ষের আইন শিখবে। প্রতিষ্ঠানটি কিন্তু হয়ে উঠল সংস্কৃত, বাংলা ও ফার্সীচর্চার একটি সুন্দর কেন্দ্র।

ব্যাপটিস্ট মিশনের জোসুয়া মার্শম্যান লিখলেন, ভারতে বৃটিশ শাসন যদি কায়েম করতে হয় তাহলে খৃষ্টধর্মের প্রসার অত্যাবশ্যক। ধীরে ধীরে, চুপি চুপি, মাথা গরম না করে, অকারণ সোরগোল না তুলে, চোরা বানের মতো খৃষ্টধর্ম ঢুকিয়ে দাও। যত খৃষ্টান বাড়বে ততই বৃটিশ রাজের বন্ধুত্ব বাড়বে। আমাদের নিরাপত্তার জন্যেই খৃষ্টানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। আর তারা তখন বাধ্য হবে আমাদের ওপর নির্ভরশীল হতে।

বৃটিশ পার্লামেন্টে উইলবার ফোর্স প্রস্তাব আনলেন, ভারতে প্রচুর পাদ্রী রপ্তানি করতে হবে। আমাদের ধর্ম স্বর্গীয়, বিশুদ্ধ, উপকারী। ভারতীয় ধর্মসমূহ ইতর, লাম্পট্যময়, নিষ্ঠুর, ঘৃণ্য। এই প্রস্তাব সংখ্যাধিক্যের ভোটে পার্লামেন্টে পাশ হয়ে গেল। ভারতীয়দের শিক্ষাদীক্ষার জন্যে ব্যয়বরাদ্দ হল। এটি তাদের ঐহিক দিক আর পারত্রিক দিকের জন্যে বছরে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড বেতনে একজন বিশপ নিযুক্ত হলেন। এঁকে সাহায্য করবেন তিনজন আর্চডিকন। প্রত্যেকের মাইনে বছরে দু হাজার পাউণ্ড। একজন থাকবেন কলকাতায়, একজন মাদ্রাজে, আর একজন বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে। বার্ষিক এই এগার হাজার পাউণ্ড আসবে ভারতীয়দের দেওয়া রাজস্ব থেকে।

শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের ঘাঁটি। ওলন্দাজদের অধিকারে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের শেষে কৃষ্ণদাস পাল নামক এক সূত্রধরকে ধর্মান্তরিত করতে পারলেন অবশেষে। স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে ওলন্দাজ সরকারের বিরাট এক সঙ্ঘর্ষ হয়ে গেল। উত্তেজনা থিতিয়েও গেল। পরের বছর কৃষ্ণদাসের শালী জয়মনিও খৃষ্টান হলেন। শ্রীরামপুরে তখন কেরী, ওয়ার্ড ও মার্শম্যান সমাজসংস্কারের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। শিক্ষাবিস্তারে, বাংলা গদ্যের চর্চায় ও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশে তাঁদের অবদান ইতিহাস হয়ে থাকবে অবশ্যই। এঁরা কাগজ উৎপাদনের কৌশলও সঙ্গে এনেছিলেন। সহমরণ প্রথার বিরোধিতা করে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। দেশীয় মানুষ এঁদের কাজে খুব খুশি; কারণ নতুন রকমের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বেশ লাগছে।

হিন্দুদের একটি শ্লোক প্রচলিত ছিল, প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চকন্যা,

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥

এই শ্লোকটির অনুকরণে লেখা হল পাঁচ ইংরেজ মহাত্মার প্রশস্তি,

হেয়ার কল্বিন্ পামরশ্চ কেরি মার্শমেনস্তথা।
পঞ্চ গোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥

সমাজ সংস্কারের সঙ্গে ধর্মান্তরকরণের উদ্দেশ্যও জড়িত ছিল। অনেক চেষ্টায় সাতশজনকে খৃষ্টান করা গিয়েছিল। শ্রীরামপুরে এই মিশনারীরা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। ছেলেদের হাতের কাজ শেখাবার জন্যে টেকনিক্যাল স্কুল। বয়স্কা মহিলারা শিখতে চাইলে বাড়িতে বাড়িতে শিক্ষিকা পাঠাতেন। বিনা ব্যয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা।

গোঁড়া হিন্দুদের এসব ভাল লাগবে কেন! আর কি সব ধারণা! একজনকে ধরে গায়ে জল ছিটিয়ে নামের আগে মাইকেল জুড়ে দিলেই তার হিন্দুর সংস্কার ঘুচে যাবে! শিক্ষার প্রসার বিশেষত স্ত্রীশিক্ষা অতি গর্হিত কর্ম। গোয়ালে গরু থাকবে আর আঁতুড়ে রমনী, শতপুত্রের জননী। 'সুধাকরে' লেখা হল সাবধান বাণী। কবি রাধামাধব মিত্র,

যুবক ধরার পক্ষে বিঘ্ন দেখি ভারী।
ফাঁদে পাতা হয়েছিলো ধরিবারে নারী॥
অন্তঃপুরে অঙ্গনাকে পড়াবার ছলে।
আরম্ভ করিল যেতে খৃষ্টানী সকলে॥
অন্তঃপুরে নিবাসিনী কুলের ললনা।
স্বভাবে সরলা সব বুঝে না ছলনা॥
সাবধান! সাবধান! যত হিন্দু ভাই।
শিক্ষাদায়িনীর বাক্যে আর ভুলো নাই॥
নারীরা না শিখে বিদ্যা সেও বরং ভালো
আঁধারে থাকুক তারা, কাজ নাই আলো॥

আমরা একবার গদাধরকে দেখে আসি। ইংরেজদের ইংরেজি খেলা আর একটু জমুক। সময়ের পথ ধরে রেলগাড়ির পিস্টনের মতো আগুপিছু করতে হবে। স্কটল্যান্ড থেকে ডেভিড হেয়ার এসেছেন কলকাতায় ঘড়ির ব্যবসা করতে। রাজা আসবেন, রাজা রামমোহন রায়। কামারপুকুর একটেরে হয়ে পড়ে আছে। ছেলেরা এখনো পাঠশালে পড়ে। জমিদারের নাটমন্দিরে পুরাণ

ভাগবতের কথকথায় সন্ধ্যার সমাবেশ ভরে যায়। এদিকটা এখনো পিছিয়ে আছে। ইংরেজি পড়া শুরু হয়নি,

পম্‌কিন লাউকুমড়া, কোকোম্বর শসা।
ব্রিঞ্জেল বার্তাকু, প্লোমেন চাষা।।

খাম্বাজ রাগিনীতে, ঠুংরি তালে ছেলেরা গাইছে না, নাই (Nigh) কাছে, নিয়র (Near) কাছে, নিয়রেস্ট তাতি কাছে। কট (Cut) কাট, কট (Cot) খাট, ফলোয়িং (Following) পাছে।

রাজা স্যার রাধাকান্ত দেববাহাদুর ইংরিজি শিখছেন। পড়াতে আসেন প্রেসিডেন্‌সি কলেজের এক বাঙালি অধ্যাপক। তাঁর পোশাক গলায় মতির মালা, পায়ে জরির জুতো। কি, কি বই? টামস্‌ ডিসের 'স্পেলিংবুক', 'কামরূপা', 'তুতিনামা'। আর একটু এগলে 'আরবি নাইট'। শুধু পড়া নয়, পয়ারে লেখা পালার সংকীর্তন — তবলা, ঢোল, মন্দিরা সহযোগে —

The chronicles of the Sassanians
That extended their dominions.

যিনি রয়েল গ্রামার পড়তেন, লোকে মনে করত তাঁর মতো বিদ্বান আর কেউ নেই। সবাই বলতেন, 'রয়েল গ্রামার হল ময়াল সাপ।' বিয়ের আসরে ইংরেজি বানান নিয়ে লড়াই হত। কেউ জিজ্ঞেস করলেন, How do you spell Nebuchadnessar? সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের প্রশ্ন, How do you spell Xerxes. বলত Xenophon বানান, তুমি বল ত Kamschtka গদাধর দাদাকে বললেন, 'পাঠশালা আমার দ্বারা হবে না দাদা?'

'মূর্খ হয়ে থাকবি?'

'ধরো তাই।'

আমার বাবা নেই। মা আমার একা। আমি মায়ের কাছে কাছে থাকব। হাতে হাতে কাজ করে দোব। গান শোনাব। পল্লীর পথে পথে ঘুরব। গৃহে গৃহে গিয়ে পালাগান শোনাব। গভীর রাতে শ্মশানে গিয়ে বসে থাকব প্রেতসঙ্গে। অবারিত রাতের আকাশ, থই থই অন্ধকার, অনন্তের ভাষা শিখব তারাদের বর্ণমালায়।

এ তুই কেমন ছেলে? সংসারের অভাব বুঝিস না! সবাই কলকাতায় গিয়ে ভাগ্য ফেরাচ্ছে। গদাধর হাসলেন। মনে মনে বললেন, সবাই নিজের ভাগ্য ফেরাতে যাচ্ছে, আমি যাব কলকাতার ভাগ্য ফেরাতে।

সাগরপারের সায়েবরা যা পারে করে নিক। তারপর শুরু হবে তোমার গদাধরের খেলা। সেই খেলার শুরুটা কিন্তু তুমিই করবে দাদা। এখনো জান না। আমাদের পরিবারে বিদ্রোহের বীজ আছে। গাছটা বড় হলে বুঝবে ফলটা কি? সাতশ বছর ধরে তরোয়ালের খেলা দেখেছে ইতিহাস। মদনমোহন বিষ্ণুপুরে দলমাদল দেগে বর্গী উড়িয়েছিলেন। কামারপুকুরের দলমাদল গদাধর জ্ঞানের গোলা ছুঁড়বে। আমার বাবা আর তুমি ওপর থেকে দেখবে। কালের গুটি কালেই খুলবে।

সংসার করবে তোমরা। তোমাদের কত কি শিখতে হবে? কত ভাবে নাচতে হবে! আমি কি সংসার করব। কামারপুকুর গ্রামের অগ্নি কোণে পুরী যাওয়ার পথের ওপর জমিদার লাহাবাবুরা যাত্রীদের সুবিধের জন্যে একটি পান্থনিবাস তৈরি করে দিয়েছিলেন। জগন্নাথ দর্শনে যাওয়ার পথে বা ফিরে আসার পথে, সাধুবৈরাগীরা আশ্রয় নিতেন। তাঁরা গ্রামে আসতেন মাধুকরী করার জন্যে। গদাধর তাঁদের জীবন দেখতেন। অনিত্য এই সংসার। আজ যারা আছে কাল তারা থাকবে না। এই যেমন পিতা ক্ষুদিরাম। ঠাকুরঘরে আসনখালি পাতা। কোশা-কুশি, গঙ্গার জলের ঘটি। ঘণ্টা, পঞ্চপ্রদীপ। সিংহাসনে রঘুবীর সেই কবে থেকে বসে আছেন! শ্বেতপাথরের বাণলিঙ্গ শিব, নাম তাঁর রামেশ্বর, মা শীতলার ঘট। পূজারী কোথায়! নগ্ন পদে, নগ্ন শরীরে হেঁটে হেঁটে চলে গেলেন সীমা টপকে অসীমে। একবার ফিরেও তাকালেন না কারা রইল। তাঁর খড়মদুটি পড়ে রইল পায়ের স্পর্শ আঁকড়ে ধরে প্রণামের মতো। সব প্রিয়জন সবশেষে দুফোঁটা চোখের জল মাত্র।

ধুনি জ্বালাও সাধু। মোহটা পুড়িয়ে ফেলি। অগ্নিই ত একমাত্র সত্য। দহনই যার কাজ। সংসার দোহন করে দহনের কোলে তুলে দেবে। ফিরিয়ে দাও, পৃথিবীর জিনিস পৃথিবীকে, জল হয়ে থাক বাষ্প, তেজ তুমি নাও, বাতাসকে ফিরিয়ে দাও বাতাস, কালকে খুলে দাও মহাকালে। সাধু ধুনি জ্বালাও। আমি কাঠ সংগ্রহ করে আনি, জল আনি। ভোগ রাঁধবে ত। ধুনি জ্বালিয়ে সকাল, সন্ধ্যা সাধুরা ধ্যান করেন। দুঃখের পৃথিবীতে দুঃখ কোথায়! মৃত্যু কোথায়! বন্ধন কোথায়!

সাধুরা আলোচনা করেন — এই সুন্দর ছেলোটি কোথা থেকে আসে! কাদের বাড়ির ছেলে? এ ত সংসারে থাকবে না। সাধু হয়ে যাবে! বেটা! ভজন করো। বালক! গলা লাগাও,

জো নর দুখ মেঁ দুখ নাহিঁ মানৈ।
সুখ সনেহ অরু ভয় নহি জাকে, কাঞ্চন মাটী জানৈ।।
হর্ষ সোক তে রহৈ নিয়ারী, নাহিঁ মান অপমানৈ।।
আসা মনসা সকল ত্যাগিকৈ, জগতে রহৈ নিরাসা।
কাম ক্রোধ জেহি পরসে নাহিন, তেহি ঘট ব্রহ্ম-নিবাসা।।
গুরু-কিরপা জেহি নর পৈ কীন্হীঁ, তিন থহ জুগতি পিছানী।
নানক লীন ভয়ো গোবিন্দ সোঁ, জ্যো পানী সঙ্গ পানী।।

সাধুরা জিজ্ঞেস করছেন, আনন্দ আসছে? বাবা! ঈশ্বর কাঁহা হ্যায়? দূরমে বহত? নহি। নেহি বাবা! ঈশ্বরতো হামলোককা বহুৎ নগিচমে রহ্‌তা। হস্তামলকবৎ। হস্তমে আমলকী রহনেসে যেত্তা নিশ্চয় হোতা, হ্যায়সা নগিচ্‌ পড়তা — উসসে ভি আউর ঈশ্বর নগিচ্‌ পড়তা; আউর যদ্যপি তুম ঈশ্বর দূরমে রহতা এহি ভাব শোচ লেও, তাভি কুছ হর্য্যা নেহি; ইসমে এক দোঁহা হ্যায় —

জলমে বৈঠে কমলিনী, সূর্য বৈঠে আকাশ
যো যিসকো হৃদয়মে বৈঠে, ওহি উসিকো পাশ।

গদাধর সাধুসঙ্গে বড় আনন্দ পায়। মাতা চন্দ্রাদেবীও মনে করেন, এ বেশ ভাল। খুব ভাল। সেদিন একটি নতুন কাপড় পরিয়ে দিয়েছেন গদাধরকে। ছেলে মহানন্দে চলে গেল সাধুধামে। অনেক পরে যখন ফিরে এল, সে এক অন্য বেশ। সর্বাঙ্গে তার বিভূতি। কোথায় সেই কাপড়। কৌপিনধারী সাক্ষাৎ মহাদেব যেন। কপালে তিলক। একটি হাড়ের মালা পরিয়ে দিলেই হয়। আর দুকানে দুটি কুণ্ডল। এক গাল হেসে ছেলে বললে, দেখ মা সাধুরা আজ আমাকে কেমন সাজিয়ে দিয়েছে!

আর তোর সেই ধুতি?

সেইটা ছিঁড়েই ত এই বেশ হয়েছে মা!

তুই কি সাধু হয়ে যাবি গদাধর? তোর বাবার মতো আমাকে ছেড়ে চলে যাবি? মায়ের দুচোখে জল। মাকে যে বড় ভালবাসে। গদাধর বললে, ঠিক আছে মা, আমি আর সাধুদের কাছে যাব না।

গদাধর সাধুদের কাছে শেষ বিদায় গ্রহণ করতে গেল, আমি যে আর আসব না গো। আমার বাবা মারা গেছেন। মায়ের ভাবনা, তোমরা যদি আমাকে নিয়ে চলে যাও। মা যে আমার কাঁদেন!

চলো তোমার মায়ের কাছে।

সাধুরা সদলে এসে হাজির হলেন। এক উঠন রোদ আর গেরুয়ার সমাবেশ। যেন বৈরাগ্যের আগুন লেগেছে।

মা মাঈ! তোমার ছেলেকে আমরা নিয়ে যাব কেন? আমরা কি ছেলেধরা। মাঈ এ তো সমঝ লেও, সাধু হওয়া যায় না, সাধু হয়ে আসতে হয়। মাঈ, এক বাত শোচ লে,

গুরু বিন্ মিলেনা জ্ঞান, ভাগ্য বিন মিলেনা সজ্জন
যোগ বিন্ মিলেনা রাজ, বল বিন্ হাটেনা দুর্জন।

বিনা গুরু জ্ঞান নেহি মিলেগা, বহুৎ ভাগ্যকা উদয় নেহি হোনেসে সাধুসজ্জনকা সঙ্গ নেহি মিলতা, আউর বহুৎ যোগ-যাগ তপস্যা নেহি রহনেসে রাজ্য নেহি মিলতা, আউর শরীরকো বল নেহি রহনেসে দুর্জন নেহি হাটেগা। মাতাজী, তোমার ছেলের সংস্কার বড়ি উত্তম। আমরা তাকে নিয়ে যাব না। এক বাত শোচ লে, তোমার ছেলে কি তোমার কাছে আছে? হায় নেহি মাঈ। উ ইধারকা নেহি, বরাব্বর উধারকা। জয় রামজী কি।

সাধুরা চলে গেলেন। মা বললেন, গদাই, তুই যাবি। ইচ্ছে হলেই যাবি। আর আমি কাঁদব না। ক্ষুদিরাম চিরবিদায়ের আগে রামকুমারকে বলেছিলেন, আমার রঘুবীর, আমার গদাধরকে দেখো। বড় দুশ্চিন্তা! গদাধর ক্রমশই যেন উদভ্রান্তের মতো হয়ে যাচ্ছে। মাঝেমাঝেই তার ভাব হয়। তখন বেশ কিছুক্ষণ জ্ঞান থাকে না। পাঠশালায় বিদ্যা না হয় না-ই হল, ব্রাহ্মণের ছেলে পূজাপাঠ শিখলেও ত যজমানি করতে পারত।

রামকুমার হিসেব করে দেখলেন গদাধরকে উপবীত দেবার বয়স হয়েছে। উপনয়ন হলে হয়ত তার স্বভাবের পরিবর্তন হতে পারে। দিন, ক্ষণ ঠিক। সহসা গদাধর বিদ্রোহী। ব্রহ্মচারী প্রথম যাঁর হাত থেকে ভিক্ষা নিয়ে 'মা' বলে ডাকবে, তিনি হলেন ধনী কামারনী।

রামকুমার সিদ্ধান্ত শুনে চমকে উঠলেন, অসম্ভব, তা কি করে হয়! আমাদের পিতা শূদ্রের দান গ্রহণ করতেন না।

আমি করব। ধনী মাকে আমি কথা দিয়েছি। মায়ের কোনো জাত থাকে না। দাদা, তোমরা যদি রাজি না হও আমার উপনয়নের প্রয়োজন নেই।

মহাসমস্যা! দাদা রামকুমার ভ্রাতার এই জেদ মেনে নিতে পারলেন না। উপনয়ন হবে এবং যথানিয়মে হবে। গদাধর ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিলেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আহারের সময় অতিবাহিত। তবু দরজা খোলে না গদাধর। ডাকাডাকিই সার। কোনো উত্তর আসে না ভেতর থেকে।

গদাধরকে সবাই ভালবাসে। পল্লীরা রমনীরা এসে ডাকাডাকি শুরু করলেন, ও গদাই! তুই একবার দরজা খোল। কোনো উত্তর নেই। বৃথাই ডাকাডাকি। সবাই ছুটলেন ধর্মদাস লাহার বাড়িতে। কি করা যায়? গোঁ ধরেছে গদাধর। উপায় কি? অনশন ব্রত নিয়ে ঘরে বসে আছে দরজা বন্ধ করে। বেরতে চাইছে না।

পারিবারিক বন্ধু ধর্মদাসবাবু সকলকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন। তিনিই মধ্যস্থ। লাহাবাবু বললেন, শাস্ত্রে এ ব্যাপারে আদেশ, নিষেধ কিছুই নেই। এটি একটি লোকাচার মাত্র। বহু সদ্‌ব্রাহ্মণ পরিবারে ব্রাহ্মণেতর জাতির হাতে ভিক্ষাগ্রহণের রীতি আছে। এতে নিন্দা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

মেজদা রামেশ্বর সিদ্ধান্ত জেনে ফিরে এসে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ভাইকে বললেন, দরজা খোল। তুই যা চাইছিস তাই হবে। ধনীই হবে তোর ভিক্ষামাতা। গদাধরের উপনয়ন সম্পন্ন হল। কামারপুকুরে আরো আটবছর থাকতে হবে। কলকাতা এখনো আটবছর দূরে।

৪৫ বছর আগে কলকাতায় ঘড়ির ব্যবসা করতে এলেন স্কটল্যান্ডের ডেভিড হেয়ার। ১৮০০ সাল। লর্ড মনিংটন বা মার্কুইস অব ওয়েলেসলি তখন লাটসাহেব। লর্ড কর্ণওয়ালিস অনেক উত্তম কাজ করে বিলেতে চলে গেছেন। ভূমি সংস্কারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেছেন। মহীশূরের সঙ্গে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হয়েছে। জেনারেল কিডের পরামর্শে শিবপুরে রয়াল বোটানিক্যাল গার্ডেন তৈরি হয়ে গেছে। কিছু উত্তরেই বিশপস্ কলেজ। বর্ধমানের মহারাজার জমিতে টেরেটি বাজার রমরম করছে।

এঁর পরেই এলেন সার জন শোর বা লর্ড টিনমৌথ। গুনী শিক্ষিত মানুষ। সার উইলিয়াম জোনসের জীবনীকার। পাঁচবছর ক্ষমতায় ছিলেন। ধর্মতলার শেক্‌সপিয়ার মার্কেট এঁরই আমলে তৈরি।

সময়কে এগতে এগতে ১৮৫০ সালে আনতে হবে, অনেক লাটসাহেবকে পেছনে ফেলে তবেই আমরা ঝামাপুকুরে কামারপুকুরের এক ব্রাহ্মণ রামকুমারের একটি টোল পাব। এই টোলটি ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সময় চিহ্ন। তার আগে সময় কি কি ফেলে যাচ্ছে তা দেখতে হচ্ছে অবশ্যই।

ওয়েলেসলির শাসনকালে ইংরেজের রাজ্যপাট আরও প্রসারিত হল।

হিন্দুদের বিশ্রী কদাকার অনেক প্রথার মধ্যে একটি অভাবনীয় ধর্মাচার ছিল, গঙ্গাসাগর তীর্থে গিয়ে মা তার নিজের প্রথম সন্তানটিকে দু'হাতে করে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিতেন। ফল, অক্ষয় পুণ্যলাভ। ওয়েলেসলি এই ভয়ঙ্কর প্রথা বন্ধ করে দিলেন। সন্তান বিসর্জন আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। ওয়েলেসলির আমলে অনেক ভাল, ভাল কাজ হয়েছিল। তাঁকে বলা হত ইংরেজ কোম্পানির 'আকবর'।

উনবিংশ শতাব্দী বাঙালির নবজাগরণের কাল। ১৮০০ সালে স্থাপিত হল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। গদাধর এই ফোর্ট অবশ্যই দেখতে যাবেন, তখন তাঁর নাম হবে রামকৃষ্ণ। তখন তিনি সামান্য একজন মানুষ নন, একটি আন্দোলনের নাম, কালের রথের সারথি।

বৃটিশ শাসকবর্গ দেশীয়দের ওপর পাদ্রিদের খবরদারি অনুমোদন করতেন না। ১৭৯৯ সালে ডাচ অধিকারভুক্ত শ্রীরামপুরে আর একটি দিক খুলে গেল। ডাক্তার মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হল 'মিশনারি সমিতি'। মালদহ থেকে কেরিসাহেব এসে এঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ওদিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, এদিকে শ্রীরামপুর মাঝখানে লর্ড মনিংটেন বা মার্কুইস অব ওয়েলেসলি। বাংলা ভাষা চর্চার দিগন্ত খুলে গেল।

শ্রীরামপুরে পঞ্চানন কর্মকার, তাঁর জামাতা মনোহর ও মনোহরের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র বাংলা হরফ তৈরি করে ফেললেন ছাপাখানার জন্যে। পুঁথির কাল শেষ হল। এইবার বাংলা হরফে বই ছাপা হবে। গঙ্গার এপারে, ওপারে একটা সেতু তৈরি হল বিদ্যাচর্চার। ভাষাচর্চার।

ফোট উইলিয়াম কলেজের জন্যে পাঠ্যপুস্তক চাই। এগিয়ে এলেন রামরাম বসু। দুটি বই লিখলেন, 'প্রতাপাদিত্য চরিত' ও 'লিপিমালা'। কে এই রামরাম। সতেরশো সালের শেষের দিকে চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। নিমতা গ্রামের এক পাঠশালায় তাঁর বিদ্যাশিক্ষা। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হল। তিনি হলেন অধ্যক্ষ। কেরিসাহেব লিখলেন, 'ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিদ্যানুরাগী পণ্ডিত আমি দেখি নাই। ১৬ বৎসর বয়সের পূর্বেই ইনি আরবী ও পারসী ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষায়ও ইহার তুল্যরূপ অধিকার ছিল।'

রাজীবলোচন কেরিসাহেবের উৎসাহে লিখলেন, কৃষ্ণচন্দ্র চরিত'। ইংরেজ ভক্তির আতিশয্যে সিরাজের চরিত্রকে যতদূর সম্ভব বিকৃত করে দেখালেন।

চারমাসের জন্যে নবাব। আর তাঁর অত্যাচারের ফিরিস্তি বিশাল। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক। রাজীবলোচন লিখলেন, সিরাজ গর্ভবতী রমনীর পেট চিরে দেখতেন সন্তান কি ভাবে থাকে। গঙ্গাগর্ভে নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে লোক কি ভাবে মরে, তাই দেখে আনন্দ পেতেন। ইত্যাদি মিথ্যাকথা।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার লিখলেন 'রাজাবলী'। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রশংসা করে মার্শম্যান লিখছেন, সাহিত্যের স্তম্ভস্বরূপ মৃত্যুঞ্জয় আমাদের দেশের বিরাট শব্দবিদ ডক্টর জনসনের সঙ্গে তুলনীয়। সংস্কৃতে তাঁর মতো সুপণ্ডিত দুর্লভ। তাঁর বাঙলা রচনার সহজ প্রকাশ এবং শক্তি অতুলনীয়।

স্বয়ং কেরিসাহেব লিখলেন একটি বাঙলা ব্যাকরণ ও অভিধান। ভূমিকায় রইল বাঙলা ভাষার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। তিনিও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

এই ওয়েলেসলির আমলেই তৈরি হলে লাটভবন। খরচ হল তের লক্ষ টাকা। আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ এইচ, এইচ লক ভেতরের ছাত অর্থাৎ সিলিং কারুকার্যমণ্ডিত করেছিলেন। তৈরি হয়ে গেল টাউন হল। খরচ হল সাত লক্ষ টাকা।

এদিকে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' ছাপার কাজ শেষ করে কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' ছাপার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এই জয়গোপাল পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হয়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে ছাত্র হিসেবে পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। অভাবনীয় এক প্রতিভা। ১৮৩৩ থেকে ৩৫ পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর ছাত্র ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ১৩ বছর বয়সে জয়গোপালের ছাত্র হয়েছিলেন। তর্কালঙ্কার মহোদয় প্রথমে তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এতটুকু বালক, তার পক্ষে কাব্যের রসগ্রহণ অসম্ভব। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ বললেন, 'এ বালক রসিক চুড়ামণি বয়সে কম হইলে কি হয়। দেখিতে নাড়ুগোপাল বটে কিন্তু এ কাব্যামোদী ও ভাবগ্রাহী। আমি উহার কুশাগ্র বুদ্ধি ও সৎকাব্যের মর্মগ্রহণ ও ব্যঙ্গোক্তি দেখিয়া সর্বদাই পরিতুষ্ট হই।'

তাহলে আমি পরীক্ষা করি। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্রকে আদিরসাশ্রিত একটি কবিতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে বললেন। ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, এর তিনটি অর্থ — বাচ্যার্থ হল এই, লক্ষ্যার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেটি

হল এই, আর ব্যঙ্গার্থ একেবারে বিপরীত।

জয়গোপাল বিস্ময়ে হতবাক। তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের বললেন, তোমরা বয়সে বড়। যুবক। তোমাদের সাধ্যই হবে না একই সঙ্গে তিনটি অর্থ বলার। এ বালক অসাধারণ। জয়গোপাল প্রতি বছর নিজের বাড়িতে খুব ঘটা করে সরস্বতী পূজা করতেন। ছাত্ররা নিমন্ত্রিত হত। আহারাদির ব্যবস্থা প্রচুর। পূজার আগের দিন জয়গোপাল উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের বলতেন পদ্যে মা সরস্বতীর বর্ণনা লিখতে। ঈশ্বরচন্দ্র কিছুতেই লিখতে চাইতেন না। একবার আর এড়াতে পারলেন না। লিখলেন,

লুচি কচুরি মতিচুর শোভিতং
জিলেপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম।
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম।

জয়গোপাল মহা খুশি। ডেকে ডেকে সকলকে পড়ে শোনাচ্ছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র তখন বিদ্যাসাগর। আর গদাধর তখন রামকৃষ্ণ। দুজনের দেখা হবে বিদ্যাসাগরের বাদুড় বাগানের বাড়িতে। ১৮৮২ সাল। বিদ্যাসাগরের বয়েস বাষট্টি বছর। রামকৃষ্ণের বয়েস ছেচল্লিশ। লর্ড রিপনের রাজত্বকাল। বিলেত থেকে লর্ড রিপনকে পাঠান হয়েছিল ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাকে সামাল দেওয়ার জন্যে। দুর্ভিক্ষ এবং আফগানিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ এই দুটি উৎপাতে ভারত তখন জর্জরিত। রিপন ছিলেন এক অতি মহাশয় ব্যক্তি। তাঁর নামটিও বেশ বড়সড়। লর্ড জর্জ ফ্রেডারিক স্যামুয়েল রিপন। রিপন ছিলেন লিব্যারাল পার্টির, গ্ল্যাডস্টোনের প্রিয় পাত্র। বাংলায় এসে রিপন প্রথমেই বিরাগভাজন হলেন জমিদারদের। তিনি এমন একটি আইন প্রণয়ন করলেন যাতে চাষীরা হলেন উপকৃত। শিক্ষিত ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হল আরও ঘনিষ্ঠ। স্থানীয় পুরসভায় তিনি ভারতীয়দের গ্রহণ করলেন। জেলার প্রশাসনেও ভারতীয়দের স্থান হল। স্বাস্থ্যশিক্ষা ও জনকল্যাণের দায়িত্বে ভারতীয়দের নেওয়ার ফলে সিভিল সার্ভিসের কর্মীরা অসন্তুষ্ট হলেন। মহীশুর রাজ্যটিকে ফিরিয়ে দিলেন মহীশুরের মহারাজকে।

১৮৮২ সালের ৫ আগস্ট। এই সালটি আমাদের এই ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফেব্রুয়ারি মাসের ২২ তারিখে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব

ভবনের দ্বারোদঘাটন হয়ে গেছে। এর আগে ১৮৮১ সালে এই আগস্ট মাসেরই ২ তারিখে গিরীশচন্দ্র ঘোষের নাটক চৈতন্যলীলা মঞ্চস্থ হয়েছে। চৈতন্যের ভূমিকায় বিনোদিনী সারাদেশকে মাতিয়ে দিয়েছেন। কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু হয়ে গেছে। ১৮৮১ সালের ১লা ডিসেম্বর ভাইসরয় লর্ড রিপন যখন কলকাতায় আসছেন, তাঁর গাড়ি যখন রাজভবনের দিকে এগচ্ছে তখন তাঁর নজরে পড়ল ইংরেজের পুলিশ এক বাঙালিকে বেধড়ক পেটাচ্ছে। লর্ড রিপন সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামাতে বললেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেট মিস্টার গ্রেমিকে, বললেন — কেন মারছে আপনি তদন্ত করে কালই আমাকে রিপোর্ট দেবেন।

এই ১৮৮২ সালেই ২৬ জানুয়ারি মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত নামে অতি সুশিক্ষিত এক বাঙালি ভদ্রলোক ইতিহাসে প্রবেশ করলেন। সেই ইতিহাসটি হল দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন। একটি বীজ কালের ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হল। পল্লবিত আকারে যার নাম হবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। অর্থাৎ কালজয়ী এক ভিন্নতর ভাগবতের সূত্রপাত। যার প্রভাবে আলোকিত হবে শতাব্দী পারের মানুষ। গঙ্গাধারার পাশে আর এক ধারা। কি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার! শতাব্দী ঘুরে গেলে এই ২৬ জানুয়ারিতেই পরাধীন ভারতবর্ষ হবে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী ভারত।

এই ১৮৮২ সালের মার্চ মাসে বেথন কলেজ থেকে দুই বাঙালি মহিলা কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও চন্দ্রমুখী বসু প্রথম স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। সারা ভারতের এরাই প্রথম স্নাতক মহিলা। ৬ এপ্রিল থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির বাংলা শাখার উদ্বোধন করলেন হেলেনা পেট্রোনভা। সন্ধ্যাবেলায়। তিনি এলেন রুশদেশ থেকে। তাঁর সঙ্গে ছি... কর্ণেল অলকট। মে মাসের ১১ তারিখে উত্তর কলকাতার শহরতলির নাগরিকরা আড়িয়াদহে একটি সমিতি গড়লেন। উদ্দেশ্য দেশের সামাজিক মানসিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমোন্নতি ঘটান। এর আগে ২৪ এপ্রিল হিন্দু স্কুল থিয়েটারে স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সমাবেশে ছাত্ররা বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করেন। একশজন ছাত্র প্রতিজ্ঞা করল একুশ বছর বয়েসের আগে তারা বিবাহ করবে না। ১৯ এপ্রিল ইডেন হাসপাতালে ভারতের প্রথম প্রসূতি সদন স্থাপিত হল। ১ জুন পরীক্ষামূলক ভাবে স্টিম ইঞ্জিনের সাহায্যে ধর্মতলা থেকে খিদিরপুর পর্যন্ত ট্রাম চালান হল। কলকাতায় প্রায় আঠার

মাইল ডবল লাইন আছে। জুন মাসের মধ্যে একুশ মাইল হবে। ঘোড়া আছে চারশ সত্তরটি। একটি ঘোড়া প্রায় বারো বছর ট্রাম টানতে পারে। ১৮ জুন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পানিহাটির চিড়া মহোৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। জুলাই মাসের ২৪ তারিখে সাহিত্যের জগতের ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটল রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার বিবাহ বাসরে। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে কবি হিসাবে স্বীকৃতি দিলেন।

৫ আগস্ট ১৮৮২। স্থান বাদুড় বাগান। সময় অপরাহ্ন বেলা। একটি ঘোড়ার গাড়ি দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে আসছিল। এমন গাড়ি অনেক আছে। এই গাড়িটির বিশেষত্ব — গাড়ির মধ্যে যিনি বসে আছেন তিনি এক অলৌকিক পুরুষ। তাঁরদিকে তাকালে চোখ ফেরান যায় না। ভগবানকে কেউ দেখেনি এঁকে দেখলে মনে হতে পারে ভগবানের রূপ, ভগবানের ভাব এইরকমই হতে পারে। গাড়িটিতে আরও কয়েকজন বাঙালি ভদ্রলোক রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। যিনি পরে আরও সংক্ষিপ্ত হয়ে হবেন শ্রীম। যে মানুষটি আমাদের প্রধান আকর্ষণ — হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে তাঁর নাম ছিল গদাধর চট্টোপাধ্যায়। তখন খুব কমজনেই তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। অধিকাংশের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন আত্মভোলা এক বালক। সেই বালক সতের বছর বয়েসে ১৮৫৩ সালে দাদার সঙ্গে কলকাতায় এলেন দাদার টোলে। তখন লর্ড ডালহৌসির রাজত্বকালের শেষদিক। আসবেন লর্ড ক্যানিং। ১৮৫৩ সালে কলকাতা সরগরম। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর প্রকাশ শুরু হয়েছে। তারকনাথ দত্ত শুরু করেছেন বাংলা মাসিক পত্রিকা 'ধর্মরাজ'। লক্ষ্য সর্ব ধর্মের মূলসূত্র এক। সুতরাং ধর্মেধর্মে কোন বিরোধ নেই — এইটি প্রচার করা। এই বছরই এক বাঙালি শম্ভুনাথ পন্ডিত কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান সরকারি উকিল নিযুক্ত হলেন। শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত সমাচার দর্পনপত্র উঠে গেল। অদ্ভুত একটি ঘটনায় সিঁদুরেপটির রামগোপাল মল্লিকের বাড়িতে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপিত হল। কারণ হিন্দু কলেজে হীরা বুলবুল নামে এক বারবণিতা পুত্র ভর্তি হওয়ায় হিন্দুরা ক্ষিপ্ত হয়ে এই কলেজটি স্থাপন করলেন। পরে এইখানেই মেট্রোপলিটন থিয়েটার হবে। শম্ভুনাথ পণ্ডিতের বাড়িতে একটি সভা গঠিত হয়েছিল। যার নাম দেওয়া হয়েছিল জ্ঞানপ্রকাশিকা সভা। সেই সভার নাম পাল্টে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ করা

হল। এই বছর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নানা ব্যাপারে নানা ধরনের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। কলকাতা তখন এতটাই জীবন্ত যে কামারপুকুরের অতি সরল বালকটির দিশাহারা হয়ে যাওয়াই উচিত ছিল। তা কিন্তু হল না। তার একমাত্র কারণ কামারপুকুরের গদাধর কলকাতায় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন জাগরণের এক মহামন্ত্র। নিয়ে এসেছেন এমন এক মশলা যে মশলায় তৈরি হবে ভারত মহিমার এক বিরাট দেবালয়। ক্রমশ।

বিজ্ঞানে বলে ভূমিকম্প ধ্বংস করে নিমেষে আর সূক্ষ্ম কম্পন যা অনবরতই চলেছে এই ভূতলে তারই প্রভাবে নদী গতি পরিবর্তন করে। সমতলভূমি হিমালয় হয়। আবার উচ্চভূমি নেমে আসে সাগরতলে। নিরীহ গদাধর কোঁচার খুঁটটি গায়ে দিয়ে তাঁর নিরীহ নির্দোষ মুখে, অতি শান্ত চলনে ঝামাপুকুরে দাদার সংস্কৃত শিক্ষার টোলে এসে বসলেন। কেউ লক্ষ্য করল না। কোনো পঞ্জিকাকার তাঁর নথিতে তারিখটি লিখলেন না। ইংরেজের শহর চারপাশে মহাকলরোলে ছুটছে। কত সভা, কত বক্তৃতা, কত আন্দোলন, তারই অন্তরালে এক যুবক তাঁর দাদার নির্দেশে জমিদারের দেবালয়ে সন্ধ্যারতির পঞ্চপ্রদীপ ঘোরাচ্ছে, ঘণ্টা বাজাচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই কামারপুকুরের সংসার চালানোয় দাদা রামকুমারকে যথাসাধ্য সাহায্য করা।

যে ঘোড়ার গাড়িটি শ্যামবাজারের পোল পেরিয়ে ক্রমে আমহার্স্ট স্ট্রিটের দিকে আসছে সেটি কোনও লাটসাহেবের গাড়ি নয়। সে গাড়িতে কোনো ক্ষমতার তকমা নেই। কিন্তু সেই গাড়িতে আসছে একটি প্রভাব যা লাটসাহেবের সমস্ত আইন, প্রাচীন শাস্ত্রকারদের সমস্ত নীতি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তার্কিকদের তর্কযুদ্ধ নিমেষে স্তব্ধ করে দিতে পারে।

এমন রূপান্তর হল কি করে? গদাধর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস! একজন খুব সহজ কথায় বলতে পেরেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ,

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে;
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।।

কালের অনন্ত অঙ্গনে কেউ ত থেমে নেই। সবই চলছে, সবাই চলছে। বাবর, আকবর, ক্লাইব, কুইন। আবার কেরি, মার্শম্যান্ ওয়ার্ড, হেয়ার, ডিরোজিও, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র। মানুষ যেখানে ধর্মও সেখানে। ধর্মেরও বিভিন্ন ধারা, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর গাণপত্য। বৈদান্তিক আবার রূপের পূজারী শঙ্করাচার্য, গৌতম বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী, হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য, নিম্বাদিত্য। মতান্তরের কারণে রামানুজ সম্প্রদায় থেকে বেরিয়ে এলেন রামানন্দ। একটি ধারা নির্গত হল রামানন্দী বা রামাৎ। এই সম্প্রদায় থেকে নিজ মহিমায় বিকশিত হলেন কবীর। পর পর কত নাম, নাভাজি, সুরদাস, তুলসীদাস, জয়দেব। কত সম্প্রদায়! যেমন খাকী, মূলকদাসী, দাদূপন্থী, রয়দাসী বা রুইদাসী, সেনপন্থী, রামসনেহি, মধ্বাচারী, বল্লভাচারী, মীরাবাই, নিমাৎ, কিথলভক্ত (বিঠ্‌ঠল), শ্রীচৈতন্য। আরও চল। কর্তাভজা, রামবল্লভী, সাহেবধনী, বাউল, ন্যাড়া, দরবেশ, সাঁই, আউল, বৈরাগী, নাগা। সন্ত তুকারাম, নানক, তন্ত্রের ধারায় কত তান্ত্রিক, রামপ্রসাদ, বামদেব, বারাণসীতে ত্রৈলঙ্গস্বামী। ইংরেজদের আগে পাদ্রী। দেয়াল তুলে দাঁড়ালেন রাজা রামমোহন। ব্রহ্ম থেকে ব্রাহ্ম। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন। সবাই এক এক দিকপাল। আগের ভারতে, দার্শনিকদের ভাবতে, সাগরপারের বিজ্ঞান ও যুদ্ধযুক্ত ভোগের ধর্ম ঢুকছে। রাজশক্তি যার সহায়। যীশুর প্রেম ঘৃণায় পরিণত হচ্ছে। হিদেনদের জর্ডনের জল ছিটিয়ে উদ্ধার করতে হবে। রাজা রামমোহন একটা ফ্রন্ট তৈরি করে বিলেতেই দেহ রাখলেন। কেশবচন্দ্র প্রবেশ করলেন ধর্মের রণাঙ্গনে। আর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র একক সংগ্রাম শুরু করে দিলেন গোঁড়া পণ্ডিতদের সঙ্গে যাঁদের হাতে পড়ে উদার হিন্দুধর্ম হয়ে উঠেছে নিপীড়নের শাস্ত্র।

দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে ওই যে ঘোড়ার গাড়িটি আসছে, ওটি সামান্য একটি ছ্যাকড়া গাড়ি নয়। বোধহয় শ্রীকৃষ্ণের রথ। ওই রথে আপাতত পার্থ নেই। পার্থ তৈরি হচ্ছেন কলকাতার সিমুলিয়া অঞ্চলে এক অ্যাটর্নির সংসারে। এই রথ যাবে সাগরপারে। পাদরিদের দেশে যীশুর প্রকৃতবার্তা নিয়ে, ঘৃণা নয়, যুদ্ধ নয়, প্রেম। প্রেমই ধর্ম, সহমর্মিতাই ধর্ম। বিচ্ছিন্নতাই পাপ, বিভেদদৃষ্টিই পাপ। এই পৃথিবীতে এক ছাড়া দুই নেই। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের বাঁশি শোনো। সেই শ্রবণেই পরিত্রাণ।

এই ঘোড়ার গাড়িটিই এই আরোহীকে নিয়ে ছ'বছর আগে ১৮৭৬ সালে বেলঘরের এক বাগান বাড়িতে গিয়েছিল। বাগানে ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর ব্রাহ্মভক্তগণ। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখছেন, 'আজ একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। সকালবেলা বাগানে ঢুকল একটি নড়বড়ে 'টিকা' গাড়ি। সেই গাড়ি থেকে নামলেন একজন এলোমেলো যুবক। কাপড় জামারও কোনো ঠিক নেই। আর আদব কায়দাতেও অনেক ত্রুটি। তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা পরিচয় করালেন এই বলে — ইনি রামকৃষ্ণ, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস। তাঁর মূর্তি দেখে প্রথমে আমরা তেমন আকৃষ্ট হইনি। অতি সরল সহজ এক যুবক। যে কটি কথা বললেন নিজের পরিচয়ের উত্তরে তাও খুব কম। কিছু না বলারই মতো। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ভাবের ঘোরে ঈশ্বরীর প্রসঙ্গ শুরু করলেন। কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলেন। তাঁর কথা শুনে আমরা সবাই মোহিত। কী গভীর জ্ঞান! কী সুন্দর কথা! আমাদের বুঝতে কিছু অসুবিধে হলনা যে ইনি কোনো সাধারণ মানুষ নন। কেশবচন্দ্র ধীরে ধীরে তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিশালী প্রভাবে কেশবচন্দ্রের ঈশ্বর বিশ্বাসী মন ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগল। নিরাকার ব্রহ্ম থেকে সাকার শক্তিরূপিণী মা কালীর দিকে যেন ঘুরে যেতে লাগল। কেশবচন্দ্র যেন এরই অপেক্ষায় ছিলেন।'

ইন্ডিয়ান মিরর-এ কেশবচন্দ্র লিখলেন, 'এই কিছুদিন আগে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার হয়েছিল। আমরা সবাই মোহিত। কী তাঁর গভীরতা! ধর্মের অতলতায় প্রবেশের কী ক্ষমতা। অথচ কি সাধারণ অতি শুদ্ধ এক সত্ত্বা! ধর্ম প্রসঙ্গে তিনি অনবরতই যেসব উপমা ব্যবহার করতে লাগলেন, যেসব তুলনা প্রয়োগ করতে লাগলেন তা যেমন সুন্দর সেইরকম যথাযথ। তাঁর মনের গঠন পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর সম্পূর্ণ বিপরীত। পরমহংসদেবের মন অতি ভদ্র, কোমল এবং ভাবগ্রাহী। আর দয়ানন্দ সরস্বতী শক্তসমর্থ পুরুষালি এবং তিনি তার্কিক।' কলকাতার ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকরা যাঁরা কেশবচন্দ্র সেনের বাগ্মীতায় মুগ্ধ, যাঁরা হিন্দুদের নানা দেবদেবীকে উপেক্ষার চোখে দেখতেন, কেশবচন্দ্র সেনের এই লেখা পড়ে কৌতূহলী হলেন। দক্ষিণেশ্বরের এই পরমহংসটি কে, যিনি

সদাসর্বদা ঈশ্বরের সঙ্গে থাকেন, অর্ধনিমিলিত চক্ষু, বেশভূষার কোনো খবর রাখেন না, সাধারণের চেয়েও সাধারণ কিন্তু অসাধারণেরও অসাধারণ, এই মিষ্টি মানুষটি কোথা থেকে এলেন, আর এমন কি নিয়ে এলেন যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কেশবচন্দ্রও অভিভূত।

ঘোড়ার গাড়িটি আমহার্স্ট স্ট্রিট ধরে চলেছে। শ্রাবণের মেঘলা আকাশ। গাড়ি রামমোহন রায়ের বাগান বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছে। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাড়াতাড়ি বলছেন — এই যে রামমোহন রায়ের বাড়ি। শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বললেন — এখন ওসব কথা ভাল লাগছে না। মহেন্দ্রনাথ লজ্জিত হলেন। বুঝতে পারেন নি পরমহংসদেব ভাবের গভীরে তলিয়ে গেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরচন্দ্রের কথাই ভাবছেন। তাঁর কত কথাই শুনেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র দুবেলা রান্না করতেন। রান্নার ফাঁকে ফাঁকেই পড়ার বই পড়ে নিতেন। কলেজে যাওয়ার সময়ে পথে বই দেখতে দেখতে যেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শুনেছেন এমন পিতৃমাতৃ ভক্তি ও ভ্রাতৃস্নেহ সহসা দেখা যায় না। কলকাতায় খুব কলেরা হত। একদিন খবর পেলেন কলকাতায় যে ভদ্রলোক তাঁদের আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁরই এক পরিচিত পরিবারের সকলে কলেরায় আক্রান্ত। তারা অতি দরিদ্র। চিকিৎসা করাবার কোনো ক্ষমতা নেই। ঈশ্বরচন্দ্র শুনলেন। সন্ধ্যেবেলা তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করে ভাই দুটিকে খাইয়ে দিলেন আর পিতার খাবার চাপা দিয়ে রেখে ছুটলেন সেই বাড়িতে। গিয়ে দেখলেন পাঁচজনেই শয্যাশায়ী। জল জল করে কাতর আর্তনাদ করছেন। মাঝে মাঝে বমি করছেন ও মলত্যাগ করছেন। ঈশ্বরচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটি বাড়ি থেকে এক কলসি জল আনলেন, চকমকি ঠুকে প্রদীপ জ্বালালেন, প্রত্যেককে জল খাওয়ালেন তারপর বেরিয়ে পড়লেন ডাক্তার ডাকতে। ঈশ্বরচন্দ্রের ভাই হরচন্দ্র এই একই রোগে মারা গিয়েছিলেন। তখন ঈশ্বরচন্দ্রের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল এই ধারণা — কলেরার রোগীর পিপাসা দূর করতে পারলে শতকরা বার আনা রোগীই বেঁচে যেতে পারে। একদিন নিমন্ত্রণ বাড়িতে ডাক্তার রূপচাঁদ বাবু এই কথাই বলেছিলেন — রোগীকে যত পার জল খাওয়াতে পারলেই উপকার পাবে। ঈশ্বরচন্দ্র রূপচাঁদবাবুর খোঁজেই যাচ্ছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে রাস্তাতেই দেখা। তিনি বললেন — চল পুলিশে যাই, গবর্ণমেন্ট থেকে যদি কোনো সাহায্য পাওয়া

যায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও নবাব নেজামতের আমল থেকেই দরিদ্র ব্যক্তির চিকিৎসার জন্যে পুলিশের হাতে টাকা ও ওষুধ মজুত রাখা থাকে। দুজনে বড়বাজার থানায় গেলেন। পুলিশ সায়েবকে বলামাত্রই তিনি কিছু ওষুধের পিল দিলেন। সায়েব বললেন — খুব সাবধান, বেশি জল যেন না খায়। ডাক্তার রূপচাঁদ বললেন — সায়েব, আপনার উপদেশেই চলব। তবে একজন মেথরানীর ব্যবস্থা করে দিন। তা নাহলে কে পরিষ্কার করবে? সায়েব অতি দয়ালু। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করে দিলেন আর বললেন — খরচের একটা বিল করে দেবেন সরকার টাকা দিয়ে দেবে। ডাক্তারবাবু বললেন — প্রথম টাকাটা কোথা থেকে আসবে? সায়েব সঙ্গে সঙ্গে নিজের পকেট থেকে দুটি টাকা বের করে দিয়ে বললেন — এটি আমার দান।

ঈশ্বরচন্দ্র ফিরে এলেন রোগীদের কাছে। পিল আর খাওয়ালেন না। সারারাত শুধু জল খাইয়ে গেলেন। ভোরের দিকে একে একে সবাই সুস্থ হয়ে উঠলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তখন বড়বাজারের গঙ্গার ঘাটে গেলেন স্নান করতে। সেখানে ডাক্তার রূপচাঁদের সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করলেন — কি খবর? ঈশ্বরচন্দ্র বললেন — প্রায় সুস্থ। শুধু জল খাইয়ে ভাল করে দিয়েছি। ডাক্তারবাবু বললেন — আরও দুদিন সেবা করতে হবে। ঈশ্বরচন্দ্র বললেন — জানি।

ঈশ্বরচন্দ্র স্নান সেরে বাড়িতে এসে রান্না বসালেন। রান্না শেষ করেই ছুটলেন সেই রোগীদের কাছে। গিয়ে দেখলেন ডাক্তারবাবুও এসে গিয়েছেন তাঁর লোকজন নিয়ে। এই হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এইরকম আরও কত ঘটনা!

শ্রীরামকৃষ্ণের মনে পড়ছে — মাথায় মালপত্র নিয়ে তিনি হাঁটতে হাঁটতে চলেছেন বীরসিংহ গ্রামে। তাঁর মতো কেউ হাঁটতে পারতেন না। কলেজের কিছু দারোয়ানের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। তারা তাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে ওই অবস্থায় দেখে মালপত্র নিজেদের মাথায় নেওয়ার জন্যে বিস্তর চেষ্টা করল। বিদ্যাসাগর কিন্তু কিছুতেই রাজি হবেন না। মিষ্টি কথায় ওদের বিদায় করে দিয়ে মালপত্র মাথায় নিয়ে যেরকম হাঁটছিলেন সেইরকমই হাঁটতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মনে পড়ছে বিদ্যাসাগর একবার বীরসিংহ থেকে কলকাতায় আসছেন। হেঁটেই আসছেন। পথে দেখলেন একটা মাঠে একজন

বৃদ্ধ চাষা মাথায় মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী হয়েছে? বিদ্যাসাগর এগিয়ে গেলেন। একটি জোয়ান ছেলের কাণ্ড, ওই বৃদ্ধেরই গুণধর পুত্র। বুড়ো বাপের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। বৃদ্ধের চলবার ক্ষমতা নেই। দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্যাসাগরের দুচোখে জল। বৃদ্ধের মাথার মালপত্র নিজের মাথায় তুললেন, বৃদ্ধের বাড়ি সেখান থেকে দুতিন ক্রোশ দূরে। নিজের মাথায় মাল নিয়ে বৃদ্ধকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র আবার হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলেন কলকাতায়।

এই ত দুবছর আগের ঘটনা, ভারত সরকার বিদ্যাসাগরকে সি.আই.ই উপাধি দিয়েছেন। এই উপাধি নিতে রাজভবনে যেতে হবে দরবারী পোশাকে। সে ত সম্ভব নয় ঈশ্বরচন্দ্রের পক্ষে। তাঁর পোশাক ত মোটা একটি থান ধুতি ও সাদা একটি চাদর। তা হলে উপায়! বিদ্যাসাগর কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যাও। ঈশ্বরচন্দ্র কয়েকদিনের জন্যে কার্মাটারে চলে গেলেন। দিনকয়েক পরে লাটসাহেবের দপ্তরখানা থেকে একজন বাঙালী কর্মচারী ও একজন চাপরাশি ঈশ্বরচন্দ্রের বাড়িতে এসে হাজির। 'সি.আই.ই'-র পদকটি নিয়ে এসেছেন, সঙ্গে 'সাইটেসান'। পদকের কাছে যাননি ঈশ্বরচন্দ্র, পদক এসেছে তাঁর কাছে।

বিদ্যাসাগর পদকটি নিলেন। কিন্তু কর্মচারী দুজন দাঁড়িয়েই আছেন। কাজ মিটে গেছে তবু কেন দাঁড়িয়ে! বকশিশ মেলেনি যে! সরকারি পুরস্কার নিয়ে এরা যেখানেই যায়, সেখান থেকেই মোটা অঙ্কের টাকা মেলে। ঈশ্বরচন্দ্রের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তিনি বললেন, 'আমি একটা কথা বলি, তাতে আমারও সুবিধে, তোমাদেরও সুবিধে। এই পদকখানা নিয়ে বাজারে কোনো বেনের দোকানে গিয়ে বেচে দাও। যা পাবে দুজনে ভাগ করে নিও।'

মহারানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উপলক্ষে ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে 'মহামহোপাধ্যায় উপাধির প্রস্তাব এল। বিদ্যাসাগর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন। আমার ঘাড়ে যথেষ্ট চাপান হয়েছে আর নয়।

এইবার তিনি খবর পেলেন তাঁর নাম 'প্রাইভেট এন্ট্রি'র তালিকায় উঠে গেছে। এটি একটি মস্ত সৌভাগ্যের কথা। এই তালিকায় যাঁদের নাম থাকে তাঁরা লাটসাহেবের সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করতে পারেন।

ঈশ্বরচন্দ্র লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করলেন। পাকা

সাহেব। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব আছে। ঈশ্বরচন্দ্র 'প্রাইভেট এন্ট্রির' লিস্টটা দেখতে চাইলেন। সায়েব ভাবলেন, বিদ্যাসাগর হয়ত কারো নাম ঢোকাতে চাইবেন।

তালিকাটি হাতে নিয়ে বিদ্যাসাগর বললেন, কথা দিন, আপনি আমার একটা অনুরোধ রাখবেন।

প্রাইভেট সেক্রেটারি বললেন, কথা দিলুম।

সাহেবের সব ভাবনা উলটে গেল। ঈশ্বরচন্দ্র একটানে তাঁর নামটি কেটে দিলেন। তালিকাটি ফেরত দিতে দিতে বললেন, কথা দিয়েছেন, আমার ওপর রাগ করতে পারবেন না। আমার অনুরোধ আপনি রাখবেন।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আসবেন শুনে ঈশ্বরচন্দ্র জানতে চেয়েছিলেন, পরমহংস! কি রকম পরমহংস? তিনি কি গেরুয়া পরেন। মহেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আজ্ঞে না, তিনি এক অদ্ভুত পুরুষ। লালপেড়ে কাপড় পরেন, জামা পরেন, বার্নিশ করা চটি জুতো পরেন, রাসমণির কালীবাড়িতে একটি ঘরের ভিতর বাস করেন, সেই ঘরে তক্তপোশ পাতা আছে — তার ওপর বিছানা, মশারি আছে, সেই বিছানায় শয়ন করেন। কোন বাহ্যিক চিহ্ন নেই — তবে ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না। অহর্নিশ তাঁরই চিন্তা করেন।

ঘোড়ার গাড়ি, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যাকে বলেছেন টিক্কা গাড়ি, বাদুড় বাগানে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ইংলিশ স্টাইল বাড়ির সামনে দাঁড়াল। শ্রীরামকৃষ্ণকে সাবধানে নামালেন মহেন্দ্রনাথ। বাড়িটি দোতলা। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভেতরে একটি বাগান আছে সুন্দর। সামনেই ফটক। প্রবেশ করে বাঁদিকে এগোলেই সদর দরজা।

মহেন্দ্রনাথ পথপ্রদর্শক। শ্রীরামকৃষ্ণ আসছেন। পরিধানে লালপেড়ে ধুতি। লংক্লথের জামা। কাপড়ের আঁচলটি কাঁধে ফেলা। পায়ে বার্নিশ করা চটি জুতো। ফুলগাছের মধ্যে দিয়ে আত্মভোলা একটি বালকের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ এগোচ্ছেন। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। মহেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, কি হল?

শ্রীরামকৃষ্ণ জামার বোতামে আঙুল রেখে বালকের মতো জিজ্ঞেস করলেন, 'জামার বোতাম যে খোলা রয়েছে! এতে কিছু দোষ হবে না ত?'

মহেন্দ্রনাথ বললেন, 'আপনি ওর জন্যে ভাববেন না, আপনার কিছুতে দোষ হবে না। আপনার বোতাম দেবার দরকার হবে না।'

বালক বুঝে গেলে যেমন নিশ্চিন্ত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরকম নিশ্চিন্ত হলেন।

পশ্চিমমুখো একতলার একটি ঘর। সেই ঘরটি পেরলেই দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে উঠছেন। জুতোর সামান্যতম শব্দও হচ্ছে না। মুখে একটা আলো ভাসছে। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা। যেন একটা বাতাসের মতো বহে যাচ্ছেন।

সিঁড়ি গিয়ে উঠল একটি বড় ঘরে। কামরার উত্তরদিকে দক্ষিণাস্য হয়ে বসে আছেন ঈশ্বরচন্দ্র। সামনে একটা চারকোণা লম্বা টেবিল। পালিশে ঝকঝকে। দক্ষিণ দিকে, পশ্চিম দিকে কয়েকখানি চেয়ার, আর পূবদিকে একটি বেঞ্চ। পেছন দিকে পিঠ-ঠেস লাগান।

কয়েকজন পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে ঈশ্বরচন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। পরনে থান কাপড়। গায়ে একটা হাতকাটা ফ্লানেলের জামা। পায়ে সেই বিখ্যাত বিদ্যাসাগরী চটি। মাথার চারপাশ উড়িষ্যাবাসীদের মতো গোল করে কামান।

শ্রীরামকৃষ্ণ টেবিলের পূবদিকে এসে দাঁড়িয়েছেন। পেছনে সেই বেঞ্চখানি। বাঁহাতটি টেবিলের ওপর আলতো করে ফেলে রেখেছেন। কোমল এক উপস্থিতি। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন বিদ্যাসাগরের দিকে। যেন কতকালের চেনা। ভাবে হাসছেন। কোনো কথা নেই। সময় যেন চলতে গিয়ে থেমে গেছে। কিছুক্ষণ পরেই মোড় ঘুরে চলে যাবে কলরোলের বাইরে ইতিহাসের শব্দহীন প্রান্তরে। দুই কলকাতা মুখোমুখি।

শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হতে পারেন যে কোনো মুহূর্তে। তখন সবাই এক দিব্য-দৃশ্য দেখবেন। প্রায় কাছাকাছি চলে গেছেন। সেই অবস্থা থেকে নিজেকে দূরে রাখার জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেন, জল খাব, জল খাব।

ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে নিজেকে বেঞ্চে বসালেন। সেই বেঞ্চে আগে থেকেই ১৭/১৮ বছরের একটি ছেলে বসেছিল। বিদ্যাসাগরের কাছে অবশ্যই সাহায্যের জন্যে এসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের ভেতর দেখতে পান। খোলা বইয়ের মতো সব পড়ে ফেলেন। বসে থাকা যুবকটির সঙ্গে নিজের

দূরত্ব বাড়াতে বাড়াতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বলছেন, 'মা! এ ছেলের বড় সংসারাসক্তি! তোমার অবিদ্যার সংসার! এ অবিদ্যার ছেলে!'

দেখতে দেখতে ঘর ভরে গেল। অনেকে এসেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের জন্যে জল ও মিষ্টি আনালেন। নিবেদন করতে করতে বললেন, 'বর্ধমানের মিষ্টি। খুব ভাল।'

সামান্য মিষ্টিমুখের পর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে কথা শুরু করলেন।

'আজ সাগরে এসে মিললুম'

ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষুরধার রসিক। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'তবে খানিকটা নোনাজল নিয়ে যান'।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে রসিকের রসিক, রসিক চূড়ামণি। তিনি বললেন, 'না গো! নোনাজল কেন?

তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর।'

শ্রোতারা সব উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কি উত্তর দেন! ঘরসুদ্ধ সবাই হেসে উঠলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আর একটু যোগ করলেন, 'তুমি ক্ষীরসমুদ্র'।

ঈশ্বরচন্দ্র মেনে নিলেন, 'তা বলতে পারেন বটে'!

ঈশ্বরচন্দ্রকে 'তুমি' সম্বোধনে কথা বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরচন্দ্র কিছু মনে করছেন না। বরং মনে হচ্ছে, এতদিনে, জীবনের শেষপ্রান্তে আত্মার এক আত্মীয় এসেছেন। যাচক, স্তাবক আর নিন্দুক পরিবৃত তাঁর জীবনে প্রকৃত ভালবাসার মানুষ বুঝি এতদিনে এলেন! আত্মীয়-বান্ধবদের কাছে বিদ্যাসাগর সহৃদয় ব্যবহার কোনোদিন পাননি। এই ত কদিন আগে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীকে লেখা একটি চিঠিতে সেই আক্ষেপ ব্যক্ত হয়েছে, 'আমার আত্মীয়েরা আমার পক্ষে বড় নির্দয়; সামান্য অপরাধ ধরিয়া অথবা অপরাধ কল্পনা করিয়া আমায় নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন।'

বিদ্যাসাগরের কৃপায় একবাবু উঁচুদরের সরকারী পদ পেয়েছেন। খুব নাম-ডাক হয়েছে। তাঁর কাছে বিদ্যাসাগরের চিঠি নিয়ে একজন এসেছেন। বাবু সোফায় বসে আলবোলায় তামাক সেবন করছেন। ইয়ার-বক্সিরা ঘিরে বসে আছেন। তামাক টানতে টানতে তিনি চিঠিটি পড়লেন। ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি!

ইয়ার-বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি?

বাবু কাত হয়েই ছিলেন, আরও একটু কাত হয়ে বললেন, ব্যাপার আর কি! বি-দ্যা-সা-গ-র ব্যবসা ধরেছে। চাকরি করে দাও, চাকরি।

অতি কোমল, অতি মৃদু স্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'তোমার কর্মসাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। সত্ত্বের রজোগুণে দোষ নেই। শুকদেব লোকশিক্ষার জন্যে দয়া রেখেছিলেন। আরও অনেকে। তুমি বিদ্যাদান করছ, অন্নদান করছ। খুব ভাল। নিষ্কাম কতে পারলেই ভগবানকে পাওয়া যাবে। যারা নামের জন্যে, নামের জন্যে পরোপকার করে, তারা নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তো তুমি আছই।'

বিদ্যাসাগর বললেন, 'সিদ্ধ! আমাকে আপনি সিদ্ধ বলছেন কেমন করে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ রসিকের সঙ্গে রসিকতা করলেন, বললেন, 'আলুপটল সিদ্ধ হলে ত নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া!' শ্রীরামকৃষ্ণ হাসছেন মৃদুমৃদু।

বিদ্যাসাগরই বা কম যান কিসে। হাসতে হাসতে বললেন, 'কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়!'

সবাই হাসছেন। খুব জমেছে। এমন মধুর সন্ধ্যা কলকাতায় আর নামবে না। বাইরে শ্রাবণের বর্ষণ। ভিজে বাতাস। ঘর ভর্তি মুগ্ধ শ্রোতার দল। পালিশ করা টেবিলের দুপাশে বিখ্যাত দুই স্পোর্টসম্যান। যাঁরা দুঃখ সুখের দুই গোলপোস্টের মাঝে জীবন নিয়ে খেলা করেন। সবাই উদগ্রীব — অপূর্ব সুন্দর, মধুর এই মানুষটি এইবার কি বলেন?

অতি মধুর কণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি তা নয় গো; শুধুই যারা পণ্ডিত তারা সব দরকচা পড়া! না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, তার নজর কিন্তু ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত, তারা শুনতেই পণ্ডিত, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত। শকুনির মতো পচা মড়া খুঁজছে। অবিদ্যার সংসারে আসক্তি। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য, এসব বিদ্যার ঐশ্বর্য।'

ঘর স্তব্ধ। পিন পড়লে শব্দ শোনা যাবে এমন। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে আলো পড়েছে। মুখে লেগে আছে অদ্ভুত এক হাসি। মনে হচ্ছে, মানুষ নন, পরিপূর্ণ আনন্দ, 'স্পিরিট ইটারন্যাল'। ঈশ্বরচন্দ্র জানেন, পণ্ডিতরা কেমন! যাঁর কাছে

বেদান্ত পড়েছেন, সেই শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির কথা মনে পড়ছে। বৃদ্ধ বয়েসে স্ত্রী বিয়োগ হল। তিনি আবার বিবাহ করবেন। গরীব বামুনের একটি অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েও পাওয়া গেছে। বাচস্পতিমশাই ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে ভালবাসেন বললে কিছুই বলা হল না, তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। ছাত্রের অমতে কাজ করবেন না। ঈশ্বরের অনুমতি চাইলেন, বাবা! আমি বিয়ে করব। পাত্রী ঠিক হয়ে গেছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, এই বৃদ্ধবয়সে নতুন করে সংসার করা আপনার উচিত হবে না। আপনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। বিয়ে করা ত দূরের কথা বিয়ের কথা ভাবাটাও পাপ।

ঈশ্বরের দুটি হাত ধরে অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের অনুমতি আদায় করতে পারলেন না। বাচস্পতিমশাই বিবাহ করলেন নিজের কন্যার বয়সী একটি মেয়েকে। ঈশ্বরচন্দ্র জানেন দুদিন পরে মেয়েটি বিধবা হবে। ঈশ্বরচন্দ্র পণ্ডিতমশাইয়ের ভিটেতে আর পা দেননি কোনদিন।

আর এক পণ্ডিত, তারানাথ তর্ক বাচস্পতি। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের পদটি ঈশ্বরচন্দ্রই তাঁকে পাইয়ে দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরমশাই তখন পঞ্চাশ টাকা মাইনের একটি চাকরি করছিলেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের একটি পদ খালি হল। মার্শাল সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রকে ওই পদটি নিতে বললেন। পদটি নিলে মাইনে অনেক বেড়ে যেত। ঈশ্বরচন্দ্র ওই পদটি তারানাথকেই দিতে চাইলেন। তারানাথ তখন অম্বিকা-কালনায়। চিঠি লিখলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। ঈশ্বরচন্দ্র সারারাত হেঁটে কলকাতা থেকে কালনায় গেলেন তারানাথের বাড়িতে খবর দিতে।

সেই তারানাথ। পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে খুব ঘটার শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায়ের দায়িত্বে তারানাথ। পণ্ডিত বিদায়ের তালিকায় রাজকুমার ন্যায়রত্নের নামের পাশে তারানাথ লিখে রাখলেন, আট টাকা।

ফর্দ দেখে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, অবিবেচনা হয়েছে। এটা হবে বারো টাকা।

বিদায়কালে রাজকুমার বারো টাকা পেলেন। পেয়ে সন্তুষ্ট হলেন না। কম হয়েছে। তারানাথ তখন বেমালুম মিথ্যা বললেন, বিদ্যাসাগর অসন্তুষ্ট হবেন, আরও বেশি হওয়াই উচিত ছিল, বিদ্যাসাগরের যেমন মর্জি। আসলে আমি আর আপনি যে বিদ্যাসাগরের 'বহু বিবাহ' বইয়ের উত্তর লিখেছি!

দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস পৃথিবীর ব্যাধিটা ধরে ফেলেছেন — কামিনী আর কাঞ্চন।

ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্তর পণ্ডিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তে প্রবেশ করছেন, বলছেন, 'ব্রহ্ম-বিদ্যা ও অবিদ্যার পার। তিনি মায়াতীত। এই জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুইই আছে; জ্ঞানভক্তি আছে আবার কামিনী-কাঞ্চনও আছে। সৎও আছে, অসৎও আছে। ভালও আছে আবার মন্দও আছে। ব্রহ্ম কিন্তু নির্লিপ্ত। যেমন প্রদীপের সামনে কেউ বা ভাগবত পড়ছে, আর কেউ বা জাল করছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত। সূর্য শিষ্টের ওপর আলো দিচ্ছে, আবার দুষ্টের ওপরও দিচ্ছে। যদি বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি — এ-সব তবে কি? তার উত্তর এই যে, ওসব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভেতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়। সাপের কিন্তু কিছু হয় না। ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন সব এঁটো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে — তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয়নি, সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারেনি।'

বিদ্যাসাগর বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'বাঃ, বাঃ এটি তো বেশ কথা। আজ একটি নতুন কথা শিখলাম।'

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ একজন মনের মানুষ পেয়েছেন। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছেন সহজ গতিতে। একের পর এক গান গাইছেন, মাঝে মাঝে স্থির হয়ে যাচ্ছে দেহসমাধিতে। এমনটি কেউ কখনো দেখেননি, এমন কথা কেউ কখনো শোনেননি।

রাত বাড়ছে। খেয়াল নেই কারো।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'নিষ্কাম কর্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়। ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি।'

কটা বাজল? নটা। লাটসাহেব এবার শুতে যাবেন। কলকাতার জমিদাররা কে কি করছেন? নিশ্চয় আমোদ করছেন। ট্যাভার্নে সায়েবরা কি পানভোজনে মত্ত! রবীন্দ্রনাথ কি করছেন! কেশবচন্দ্র সেন সমাজ থেকে কমলকুটীরে ফিরছেন। ডেপুটি বঙ্কিমচন্দ্র! আনন্দমঠের শেষ পরিচ্ছেদ লিখছেন।

ব্রাহ্মসমাজের সভাকক্ষের আলো সব নিবে গেছে। অন্ধকারে শূন্যবেদী। প্রার্থনা সঙ্গীতের সুর ধূপের ধোঁয়ার মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। গিরিশচন্দ্র এখনই বাড়ি ফিরবেন না। কলকাতার বিশেষ বিশেষ অঞ্চল যত রাত বাড়ে তত জেগে ওঠে। গঙ্গার ধারে ফোর্টের কাছে, আউটরামের রাস্তায় ফিটনে বেড়াতে বেরিয়েছেন বিবিরা। নরেন্দ্রনাথ কি করছেন? গত বছর ত এফ.এ. পাশ করেছেন। কলকাতার এক বড়লোক তাঁর মেয়ের জন্যে নরেন্দ্রনাথকে নির্বাচন করেছেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন। দশ হাজার টাকা নগদ দেবেন। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শ পেয়েছেন। অসীমের স্বাদ পেয়েছেন। বউ! সংসার! কে বিয়ে করবে? কাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, 'যা, যা বললুম এতক্ষণ সবই আপনি জানেন। তবে খপর নেই।' সবাই হাসছেন। এতক্ষণে 'আপনি' সম্বোধনে দূরত্ব তৈরি করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এইবার তিনি চলে যাবেন। আর দেখা হবে না। ঈশ্বরচন্দ্র আরো ন'বছর এই পৃথিবীতে থাকবেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আর মাত্র চার বছর! কেউ জানে না সেই 'খপর' এই মুহূর্তে; জানে কালের ঘড়ি।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রোতাদের হাসির সঙ্গে নিজের হাসি মিলিয়ে দিয়ে আরো বললেন, 'যেমন বরুণের ভাণ্ডারে কত রত্ন, বরুণ রাজার খপর নাই।'

বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে বললেন, 'তা আপনি বলতে পারেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, 'হ্যাঁ গো, অনেক বাবু জানে না চাকর-বাকরের নাম, বা বাড়ির কোথায় কি দামী জিনিসপত্র আছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। সকলেই দাঁড়িয়েছেন। বিদ্যাসাগরমশাই চেষ্টা করছেন বেরিয়ে আসার। সামনে টেবিল পেছনে চেয়ার, চারপাশে লোক। দণ্ডায়মান শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঈশ্বরচন্দ্র মুখোমুখি। শ্রীরামকৃষ্ণ মৃদুস্বরে বললেন, 'একবার বাগান দেখতে যাবেন, রাসমণির বাগান, ভারী চমৎকার জায়গা।'

শ্রীরামকৃষ্ণ কালীবাড়ি বললেন না। বিদ্যাসাগরের বিশ্বাস রূপ অথবা অরূপ কোনটি প্রবল অন্তর্দর্শী শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝে ফেলেছেন। জ্ঞানীর ব্রহ্ম, ভক্তের ভগবান।

বিদ্যাসাগর বললেন, 'যাব বই কি। আপনি এলেন আর আমি যাব না!'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আমার কাছে? ছি! ছি!'

বিদ্যাসাগর বললেন, 'সে কি! এমন কথা বললেন কেন? আমায় বুঝিয়ে দিন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসছেন আর বলছেন, 'আমরা জেলেডিঙি! খাল বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, কি জানি যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়।'

বিদ্যাসাগর নিঃশব্দে হাসছেন, শ্রীরামকৃষ্ণও হাসছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'এ-সময় জাহাজও অবশ্য যেতে পারে!'

ঈশ্বরচন্দ্র হাসছেন আর বলছেন 'হ্যাঁ, এটা তো বর্ষাকাল বটে!'

শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার স্তব্ধ। মূলমন্ত্র করে জপছেন। জপের পথে ভাবাবিষ্ট। এই গৃহের কল্যাণ হোক. পরিবার-পরিজনের মঙ্গল হোক। বাঙলার গৌরব ঈশ্বরচন্দ্রের পথ আলোকিত কর মা। অহেতুক কৃপা সিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ।

ঈশ্বরচন্দ্র আগে আগে চলেছেন হাতে বাতি। শ্রীরামকৃষ্ণ এক ভক্তের হাত ধরে ধীরে ধীরে নামছেন। বাইরের বাগান তলিয়ে আছে তরল অন্ধকারে। অনেকটা ওপর থেকে দেখলে, শ্রাবণের আকাশ যদি দেখে! তাহলে দেখবে, বাগানের অন্ধকার পথে ছায়ামূর্তির মতো কয়েকজন মানুষ ফটকের দিকে এগিয়ে চলেছেন। একজনের হাতে একটি আলো। তিনি শক্তসমর্থ। তাঁর পায়ে অনেক জোর। তিনি তাঁর হজমশক্তি ফিরে পাওয়ার জন্যে চিকিৎসকের উপদেশ চেয়েছিলেন। উপদেশ হল, যত পারেন হাঁটুন। ঈশ্বরচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, আমি ত হাঁটার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছি। রাত্রে কেবল কয়েক ঘণ্টার বিরতি। তাহলে তখনো কি হাঁটব।

ফটকের বাইরে দুর্বল ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করছে।

কিন্তু ইনি কে? সুন্দর এক দৃশ্য রচনা করে একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ফর্সা ধপধপে রঙ। পরিধানে দুগ্ধ শুভ্র পোশাক। মাথায় শিখদের মতো পাগড়ি। বুকের ওপর কাঁচা-পাকা দাড়ি ঝুলছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সামনে আসা মাত্রই তিনি সেই পথের ওপরেই ভূমিষ্ঠ হয়ে উষ্ণীষসমেত মাথাটি ভূমিতে লুটিয়ে দিয়ে প্রণামে স্থির। অনেকক্ষণ। অবশেষে উঠে দাঁড়ালেন। ৩৬/৩৭ বছরের সৌম্য, সুঠাম এক যুবক।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'বলরাম! তুমি? এত রাত্রে?'

অন্ধকারে তাঁর মিষ্ট হাসির শব্দ শোনা গেল, তারপর কণ্ঠস্বর, 'আমি অনেকক্ষণ এসেছি। এখানে দাঁড়িয়েছিলাম।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'সে কি? ভেতরে যাওনি কেন?'

বলরামের বিনীত উত্তর, 'আজ্ঞে, সকলে আপনার কথা শুনছেন। তার মাঝে গিয়ে বিরক্ত করা।' বলরাম আবার হাসলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। বিদ্যাসাগরমশাই খুব মৃদুস্বরে মহেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করছেন, 'ভাড়া কি দেব?'

মহেন্দ্রনাথ বললেন, 'আজ্ঞে না, ও হয়ে গেছে।'

ঈশ্বরচন্দ্র ও অন্য সকলে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন।

গাড়ি ছেড়ে দিল। যাচ্ছে উত্তরমুখো দক্ষিণেশ্বরের দিকে। আলোটি হাতে নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন ফটকের কাছে। গাড়ির গমনপথের দিকে তাকিয়ে। তাঁকে ঘিরে আছে অনেক ছায়া। দূরত্ব বাড়তে বাড়তে একসময় দুপ্রান্তই অদৃশ্য।

পড়ে রইল জনশূন্য রাতের নির্জন পথ। কাল চলে গেল কালান্তরে।

বাঁয় ছোড়ায়কে যাতে হো।
দুর্ব্বল যান্‌কে মোর।।
হৃদয় সে যব্ যানে স্যেকো।
তব জানেঙ্গে তোয়।।
[যাও না দেখি হৃদয় ছেড়ে কেমন তুমি পার!]

সেই অলৌকিক ঘোড়ার গাড়িটি যেটি সময়ে অসময়ে কলকাতার রাজপথে যাওয়া-আসা করত সেটিকে আর দেখি না কেন? শীর্ণ একটি ঘোড়া, জীর্ণ একটি গাড়ি; কিন্তু আরোহীকে দেখলে মনে হত মহামূল্যবান। সেই গাড়িটিকে আর দেখি না কেন?

একদিন দেখি দাঁড়িয়ে আছে স্টার থিয়েটারের সামনে। দক্ষিণেশ্বর থেকে তিনি এসেছেন গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' দেখতে। তিনি বাঙালীর থিয়েটার আর অভিনেতা অভিনেত্রীদের ধন্য করে ফিরে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ছোট্ট ঘরখানিতে। গিরিশচন্দ্রকে একটি টাকা দিয়েছিলেন টিকিটের মূল্যবাবদ। গিরিশচন্দ্র সেই টাকাটিকে রোজ পূজা করেন।

একদিন দেখি গাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে ব্রাহ্মসমাজের সামনে। যুবক নরেন্দ্রনাথ অনেকদিন দক্ষিণেশ্বরে যাননি, তাই তিনি নরেন্দ্রনাথের খবর নিতে এসেছিলেন। ব্রাহ্মরা সেদিন খুব অভদ্র ব্যবহার করেছিলেন। সমাজকক্ষের আলো নিবিয়ে অন্ধকার করে দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অপমানে নরেন্দ্রনাথ সেদিন চোখের জল ফেলেছিলেন। তিরস্কার করেছিলেন প্রভুকে। আমার জন্যে আপনার এই লাঞ্ছনা। আপনি জানেন না, আপনার সংস্পর্শে এসে স্বয়ং কেশবচন্দ্র পালটে গেছেন। বদলে গেছেন। জ্ঞানমার্গ ছেড়ে ভক্তিমার্গে এসেছেন। বিজয়কৃষ্ণ সব ছেড়ে ভক্ত বৈষ্ণব। অন্যান্য নেতারাও পালটে যাচ্ছেন। তাই শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ কট্টর ব্রাহ্মরা আপনাকে সহ্য করতে পারেন না। আপনার বিরূপ সমালোচনা করেন। আপনার সমাধিকে বলে স্নায়ুদৌর্বল্য। ইণ্ডিয়ান মিরারে লিখেছে — শারীরিক দুর্বলতার কারণে তিনি প্রায়ই মৃতবৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন।

দেখলুম সেই অশ্বযান ফিরে চলেছে পোল পেরিয়ে দক্ষিণেশ্বরের দিকে। শিবের মতো এক যুবক বসে আছেন পাশে। বহুমূল্য এক প্রতিমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছেন মন্দিরে। বাতাসে যেমন টেবিলের ওপর থেকে কাগজ উড়ে উড়ে পড়ে। সেইরকম গাড়িটি থেকে তাঁর টুকরো টুকরো কথা কালের পথে উড়ে উড়ে পড়তে লাগল। আমি যে তোর জন্যে ভিক্ষে করতেও পারি রে নরেন। আমার অপমান! আমি যে মান অপমানের পারে।

একদিন দেখি গাড়িটি দাঁড়িয়ে রয়েছে সার্কুলার রোডে 'কমলকুটীর'-এর সামনে। ঘোড়াটিকে ঘাস দিয়েছে গাড়ির চালক। ঘাস খাচ্ছে ঘোড়া। সেই অপূর্ব, অদ্ভুত আরোহী কোথায়! তিনি ভেতরে গেছেন। বন্ধু কেশবচন্দ্র সেন অত্যন্ত অসুস্থ। চারিদিকের নানা চাপে তাঁর শরীর ও মন দুটিই ভেঙে পড়েছে। কুচবিহারের রাজার সঙ্গে নিজের নাবালক কন্যার বিবাহ দেওয়ায় ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে দুটুকরো হল। মন্দির দখলের লড়াইয়ে পুলিস এল। পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুড়ি। স্থাপিত হল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। দেবেন্দ্রনাথ নাম শুনে বলেছিলেন, বেশ নাম হয়েছে। আমারটা 'আদি', অর্থাৎ আমি কালে আছি, কেশবের হল 'ভারতীয়', সে দেশে আছে। তোমাদেরটা দেশ-কালের অতীত। বড় দুঃখের দিনে কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে পাশে পেয়েছিলেন। বিদায় নেওয়ার আগে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে জেনে গিয়েছিলেন, 'একমাত্র কেশবেরই ফাতনা ডুবেছে।'

শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যাঁরা কেশবচন্দ্রকে ত্যাগ করেছিলেন, তাঁরাও ত এই অদ্ভুত সাধককে গ্রহণ করেছিলেন। এই ত, শাস্ত্রীমশাই লিখছেন, 'ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের একজন দক্ষিণেশ্বরে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে শ্বশুরবাড়ি হইতে আসিয়া আমাকে বলিতেন যে দক্ষিণেশ্বরের কালীর মন্দিরে একজন পূজারী ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহার কিছু বিশেষত্ব আছে। এই মানুষটি ধর্মসাধনের জন্যে অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। শুনিয়া রামকৃষ্ণকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। যাইব যাইব করিতেছি, এমন সময় মিরার কাগজে দেখিলাম যে, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত কথা কহিয়া প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া আসিয়াছেন। শুনিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইবার ইচ্ছাটা প্রবল হইয়া উঠিল। আমার সেই বন্ধুটিকে সঙ্গে করিয়া একদিন গেলাম।

প্রথম দর্শনের দিন হইতেই আমার প্রতি রামকৃষ্ণের বিশেষ ভালবাসার লক্ষণ দৃষ্ট হইল। আমিও তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ চমৎকৃত হইলাম। আর কোনও মানুষ ধর্মসাধনের জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন কি না জানি না। রামকৃষ্ণ আমাকে বলিলেন যে, তিনি কালীর মন্দিরে পূজারী ছিলেন। সেখানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আসিতেন। ধর্মসাধনার্থে তাঁহারা যিনি যাহা বলিতেন, সমুদয় তিনি করিয়া দেখিয়াছেন। এমনকি, এইরূপ সাধন করিতে করিতে তিনি ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন, কিছুদিন উন্মাদগ্রস্ত ছিলেন।

শাস্ত্রীমশাই একটি জিনিস ঠিক ধরতে পারেন নি, সেটি হল শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি। তাই লিখছেন, 'তদ্ভিন্ন তাঁহার একটি পীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাঁহার ভাবাবেশ হইলেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইতেন। এই সংজ্ঞাহীন অবস্থাতে আমি তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি ; এমনকি, অনেকদিন পরে আমাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার আলিঙ্গনের মধ্যেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া গিয়াছেন।'

লিখছেন শিবনাথ শাস্ত্রী, 'সে থাক্। রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়া এই একটা ভাব মনে আসিত যে, ধর্ম এক; রূপ ভিন্ন ভিন্ন মাত্র। ধর্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্ণ কথায় কথায় ব্যক্ত করিতেন। ইহার একটি নিদর্শন উজ্জ্বল রূপে স্মরণে আছে। একবার আমি দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সময় আমার ভবানীপুরস্থ খ্রীস্ট্রীয় পাদরী বন্ধুটিকে সঙ্গে লইয়া গেলাম; তিনি আমার মুখে

রামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। আমি গিয়া যেই বলিলাম, 'মশাই, এই আমার একটি খ্রীস্ট্রান বন্ধু আপনাকে দেখতে এসেছেন', অমনি রামকৃষ্ণ প্রণত হইয়া মাটিতে মাথা দিয়া বললেন, 'যীশু খ্রীস্টের চরণে আমার শতশত প্রণাম।'

আমার খ্রীস্টীয় বন্ধুটি আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মশাই, যে যীশুর চরণে প্রণাম করছেন, তাঁকে আপনি কি মনে করেন?'

উত্তর। কেন, ঈশ্বরের অবতার।

খ্রীস্টীয় বন্ধুটি বলিলেন, ঈশ্বরের অবতার কিরূপ? কৃষ্ণাদির মতো?

রামকৃষ্ণ। হ্যাঁ, সেইরূপ। ভগবানের অবতার অসংখ্য, যীশুও এক অবতার।

খ্রীস্টীয় বন্ধু। আপনি অবতার বলতে কি বোঝেন?

রামকৃষ্ণ। সে কেমন তা জান? আমি শুনেছি, কোন কোন স্থানে সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়। অনন্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে, এক জায়গায় দেখে বিশেষ কারণে খানিকটা জল জমে গেল; ধরবার ছোঁবার মত হল। অবতার যেন কতকটা সেইরূপ। অনন্ত শক্তি জগতে ব্যপ্ত আছেন, কোন বিশেষ কারণে কোনও এক বিশেষ স্থানে খানিকটা ঐশী শক্তি মূর্তি ধারণ করলে, ধরবার ছোঁবার মত হল। যীশু প্রভৃতি মহাজনদের যে কিছু শক্তি সে ঐশী শক্তি, সুতরাং তাঁরা ভগবানের অবতার।

রামকৃষ্ণের সহিত মিশিয়া আমি ধর্মের সার্বভৌমিকতার ভাব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছি।

ইহার পর রামকৃষ্ণের সহিত আমার মিত্রতা আরও ঘনীভূত হয়। এমন দিনও গিয়াছে, আমাকে অনেকদিন দেখিতে না পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার ভবনে আসিয়াছেন।'

আর দেখি না কেন সেই গাড়ি। কখনো দিবা দ্বিপ্রহরে। কখনো অপরাহ্নে। দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে আসছে দেবতার মতো এক আরোহীকে নিয়ে। বরাহনগর বাজারের খাবারের দোকানের মালিক ফাগু রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকেন, কত গাড়িই ত যায়, সেই গাড়িটি আর যায় না কেন! তিনি যে আমার দোকানের কচুরি খেতে ভালবাসেন! বিবিবাজারে দেশীমদের দোকানের মালিক জয়সওয়াল, তারও একই দুঃখ আগে এই

পথ দিয়ে ভগবানের সেই গাড়ি যেত। আমি দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে নমস্কার করতুম, তিনি মাতালদের দেখে খুব আনন্দ পেতেন।

তিনি কোথায়? কলকাতা যে থমকে গেছে।

তাঁকে দেখতে চাও। এসো। এটি একটি উদ্যানবাটী। পরে এটি কাশীপুর উদ্যানবাটী নামে ইতিহাসে বিখ্যাত হবে। ধীরে এসো। সাবধানে এসো। শব্দ করো না। এখানে এখন মহাযজ্ঞ হচ্ছে। আজ ঝুলন পূর্ণিমা। ১৫ আগস্ট, ১৮৮৬। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। চারপাশে আলো ঝরছে। গাছের পাতা চুঁইয়ে চুঁইয়ে। চারিদিক নীরব, নিথর। এই বাগানটি রানী কাত্যায়নীর জামাতা গোপালচন্দ্র ঘোষের। এই যে দেখছ গাছ, প্রতিটি গাছের তলায় সঞ্চিত আছে দুর্লভ সব মুহূর্ত। এই উদ্যানভূমিতে নরেন্দ্রনাথ একদিন সন্ধ্যা থেকে সারারাত 'রাম' 'রাম' বলে চিৎকার করতে করতে ছোটাছুটি করেছিলেন। শেষে তাঁর বাহ্যজ্ঞান ছিল না। আত্মার ক্রন্দন। হৃদয় দীর্ণ। ওই গাছের তলায় আগুন জ্বালিয়ে সারা রাত সাধনা। এই গাছ, ওই গাছ, সব গাছ এই ভূমির আটমাসের সাধন কাণ্ডের সাক্ষী।

এটি 'দানাদের ঘর'। এই ঘর থেকে বেরিয়ে আসবেন একদল ত্যাগী সন্ন্যাসী। পৃথিবীতে প্রচার করবেন এমন এক ধর্ম যা কোনো গোষ্ঠীর নয়, সকলের। সেই ধর্মের একটা হৃদয় থাকবে, পরিষ্কার যুক্তিবাদী একটি মস্তিষ্ক থাকবে, দুটি চোখ থাকবে জলে ভরা। নেতা হবেন নরেন্দ্রনাথ। জগৎ জানবে যাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ নামে। যাঁরা এসেছিলেন ভারতবিজেতা হয়ে, তাঁরাই হবেন বিজিত আত্মার শক্তিতে। রাজ্য ত এতটুকু একটা অধিকার! মানুষের মন? সে ত অনন্তের বিস্তার। যে গাড়িটির অনুসন্ধান করছ কলকাতার রাজপথে, সেটি আর একটু পরেই এই মহানিশায় নভোযানে পরিণত হবে। শুরু হবে বায়ুমণ্ডলে মহাবিচরণ।

এই কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে উঠে এস দোতলায়। শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর কর। দেখ, কেমন করে বরফ গলে মিশে যায় অনন্তের সমুদ্রে। ওই দেখ, পাঁচটি বালিশ, একের ওপরে আর এক, ঠেস দিয়ে বসে আছেন। শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। মাঝে মাঝে কুম্ভক হয়ে যাচ্ছে। ওই দেখ অদূরে বসে আছেন নরেন্দ্রনাথ, স্তব্ধ গম্ভীর পর্বতের মতো। সব ছেড়ে এই দেবতার সঙ্গে প্রাণে প্রাণ বেঁধেছিলেন।

ওই অবগুণ্ঠনবতী রমনী? অশ্রু বিসর্জন করছেন?

উনিই ত সেই জয়রামবাটীর সেই সারদা! পুকুরে দলঘাস কাটছেন কোমরজলে দাঁড়িয়ে। গরুর খাবার। মায়ের সঙ্গে পইতে কাটছেন হাটে বিক্রি হবে। ভাই বোনদের মানুষ করছেন কোলে পিঠে করে। দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের পরিবেশন করা গরম খিচুড়ি পাখার বাতাসে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছেন। অনাহারী মানুষদের বড্ড ক্ষিদে। তেলোভেলোর প্রান্তরে বাগদী ডাকাত ও তার স্ত্রীকে বাবা আর মা সম্পর্কে চিরতরে বেঁধে ফেলছেন। সেই সারদা!

শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বান, চলে এস আমার শক্তি। অনেক কাজ আছে। চলে এস। চুপ করে শোন, বিদায়ক্ষণের বার্তা।

ক্ষীণ কণ্ঠস্বর! গলাটা যে খেয়ে ফেলেছে ক্যানসারে! যে-গোমুখী দিয়ে নিঃসৃত হয়েছিল অমৃত বাণী ও সঙ্গীত। ওই শোনো কি বলছেন তিনি সহধর্মিনী সারদাকে 'তোমার ভাবনা কি? যেমন ছিলে তেমনি থাকবে। এরা, এই নরেন্দ্ররা আমার যেমন করেছে, তোমারও তেমনি করবে।' কোথাও একটা ঘণ্টা পড়ল। ঘড়ির! রাত একটা!

নরেন্দ্রনাথের কানে ফিস ফিস করে কি বলছেন! বলছেন বোধহয়, 'দেখিস'? এই কথার সীমাহীন তাৎপর্য। তারপর তিনবার মায়ের নাম, কালী, কালী, কালী। শরীরে খেলে গেল আনন্দের শিহরণ, রোমাঞ্চিত, মাথার সমস্ত চুল খাড়া, মুখমণ্ডলে প্রদীপের আলোর মতো দিব্য হাসির উদ্ভাস। চলে গেলেন। প্রবেশ করলেন মহাসমাধিতে।

শৃঙ্খলটিও বুঝি নিয়ে গেলেন। ভারত স্বাধীন হল, ১৫ আগস্ট ১৯৪৭।

সাতদিন পরে ওই দেখ! উদ্যানের ফটক খুলে গেছে। বেরিয়ে আসছে একটি ঘোড়ার গাড়ি। কে বসে আছেন? জননী সারদা। ভেতরে তাঁর কে আছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ। শিব প্রবেশ করেছেন শক্তিতে। তন্ত্রে আছে পার্বতী শিবকে গিলে ফেলেছিলেন।

গাড়িটির গন্তব্যস্থল? সেই ভক্ত বলরাম বসুর গৃহে। সেই বলরাম! শুভ্র পোশাক, শুভ্র বর্ণ, শুভ্র উষ্ণীষধারী। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ফটকের বাইরে এক শ্রাবণসন্ধ্যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনের আশায়। বলরাম বসুর গৃহকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন — তাঁর কলকাতার কেল্লা। পরে এটি পরিচিত হবে — বলরাম মন্দির হিসাবে।

কাল! তোমার দীর্ঘ পথচলায় কি দিলে?

তরোয়ালধারী মুসলিম শাসককুলের রেখে যাওয়া জড়স্তূপ তাজমহল।

বিজ্ঞানধারী ইংরেজের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।

আর ওই দেখ গঙ্গার পশ্চিমকূলে নরেন্দ্রনাথের শ্রীরামকৃষ্ণের চৈতন্যমন্দির — বেলুড় মঠ। অবরোধহীন কালের কল্লোলিনী। আরও আছে জাহ্নবীর পূর্বতীরে মায়ের মন্দির। আর তাঁদের অম্লান কণ্ঠস্বর — উদ্বোধন।